দাম : বারো টাকা

স্বস্তিকা

৭৩ বর্ষ, ৮ সংখ্যা।। ৫ অক্টোবর, ২০২০।। ১৮ আশ্বিন - ১৪২৭
যুগাব্দ ৫১২২।। website : www.eswastika.com

কৃষি বিলে ক্ষতি কার ?

স্বস্তিকা

।। বাংলা সংবাদ সাপ্তাহিক।।

৭৩ বর্ষ ৮ সংখ্যা, ১৮ আশ্বিন, ১৪২৭ বঙ্গাব্দ

৫ অক্টোবর - ২০২০, যুগাব্দ - ৫১২২,

Website : www.eswastika.com

সম্পাদক : রন্তিদেব সেনগুপ্ত

সহ সম্পাদক : সুকেশ চন্দ্র মণ্ডল

প্রচ্ছদ ও রূপায়ণ : অজিত কুমার ভকত

দূরভাষ :

সম্পাদকীয় : ৮৪২০২৪০৫৮৪ (W)

সার্কুলেশন : ৮৬৯৭৭৩৫২১৫

সার্কুলেশন হোয়াটস্ অ্যাপ নম্বর : ৮৬৯৭৭৩৫২১৪

অফিস : ৯৮৭৪০৮০৩৫৪, ৯৮৭৪০৮০৩৪১

অফিস হোয়াটস্ অ্যাপ নম্বর : ৮৬৯৭৭৩৫২১৬

বিজ্ঞাপন : ৯৮৭৪০৮০৩৪৩

দাম : ১২ টাকা

বার্ষিক গ্রাহক মূল্য ৫০০ টাকা।

Postal Registration No.- KOL RMS/048/2019-2021

R N I No. 5257/57

দূরভাষ : ২২৪১-০৬০৩ / ৫৯১৫

E-mail : swastika5915@gmail.com

vijoy.adya@gmail.com

Website : www.eswastika.com

ওঁ স্বস্তিক প্রকাশন প্রাইভেট লিমিটেড-এর পক্ষে প্রকাশক এবং মুদ্রক সারদা প্রসাদ পাল কর্তৃক ২৭/১বি, বিধান সরণি, কলকাতা-৬ থেকে প্রকাশিত এবং সেবা মুদ্রণ, ৪৩, কৈলাশ বোস স্ট্রীট, কলকাতা-৬ হতে মুদ্রিত।

সূচীপত্র

সম্পাদকীয় □ ৩

বাবরি মামলায় আদবানীরা নির্দোষ প্রমাণিত হওয়ায় বামপন্থীদের বহুদিনের সাজানো মিথ ভেঙে পড়েছে

□ অভিমন্যু গুহ □ ৪

নয়া কৃষি বিল ২০২০ : গ্রামীণ অর্থনীতিতে জোয়ার আনবে

□ সুদীপ নারায়ণ ঘোষ □ ৬

কৃষি বিলে ক্ষতি কার ? □ ড. নারায়ণ চক্রবর্তী □ ৯

কৃষি বিল নিয়ে আমাদের রাজ্যের শাসক দলের এত আপত্তি কেন ? □ বিশ্বপ্রিয় দাস □ ১১

কৃষকের মুক্তির বাধা দালালি শক্তি □ কল্যাণ গৌতম □ ১৩

ভণ্ড সেকুলারদের কবল থেকে মুক্ত হয়ে দেশ শক্তিশালী হয়ে উঠছে □ ড. মনমোহন বৈদ্য □ ১৬

বর্তমান ভারতের দুর্দশার প্রধান কারণ ইংরেজ ও নেহরু সম্প্রদায় □ পুলকনারায়ণ ধর □ ২০

ভারতকে শেষ করার চক্রান্ত চলছে, এখনই সাবধান হতে হবে

□ আবীর গাঙ্গুলী □ ২৪

আসন্ন বিহার নির্বাচনে এন ডি এ-র জয় সুনিশ্চিত করার সঙ্গে সংক্রমণ বৃদ্ধি আটকানো জরুরি □ চাণক্য □ ২৮

কমিউনিস্ট চীনের স্বরূপ ধীরে ধীরে উন্মোচিত হচ্ছে □ ৩০

ভারতীয় শিক্ষার স্বরূপ : ধর্মপুরুষার্থ ও শিক্ষা

□ ইন্দুমতী কাটদরে □ ৩৩

ভারত বিরোধী সংবাদমাধ্যম এবং হিন্দু বিরোধিতা

□ ডা: আর এন দাস □ ৩৫

বাবরি ধাঁচা বিলয়ের রায়দানে হিন্দুসমাজ উচ্ছ্বসিত

□ সুব্রত বন্দ্যোপাধ্যায় □ ৩৮

বিদ্যাসাগর : এক অনন্য জীবন □ সাগ্নিক বন্দ্যোপাধ্যায় □ ৩৯

আদিকবি বাল্মীকি □ রাজদীপ মিশ্র □ ৪২

সংবাদ □ ৪৩

জননী জন্মভূমিশ্চ স্বর্গাদপি গরীয়সী

সম্পাদকীয়

কৃষি বিল কৃষকেরই স্বার্থে

প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী বারংবার দেশবাসীকে আত্মনির্ভর ভারত গঠন করিবার বার্তা দিয়েছেন। করোনা উদ্ভূত পরিস্থিতিতে বিশ্বব্যাপী আর্থিক ও সামাজিক সংকট দেখা দিয়েছে, তাহার পরিপ্রেক্ষিতে আত্মনির্ভর ভারত গঠন করাটা যে কতখানি জরুরি—তাহাও স্মরণ করাইয়া দিয়াছেন প্রধানমন্ত্রী। ভারতকে আত্মনির্ভর করিয়া তুলিতে হইলে কৃষিক্ষেত্রের সার্বিক উন্নতি এবং কৃষকের আর্থ-সামাজিক অবস্থারও প্রভূত উন্নতিসাধন দরকার। ভারতবর্ষের গরিষ্ঠাংশ মানুষের জীবন-জীবিকা নির্ভর করে কৃষিক্ষেত্রের উপর। ফলে, কৃষিক্ষেত্রের উন্নতি ব্যতীত আত্মনির্ভর ভারতের কল্পনা করা অসম্ভব। নরেন্দ্র মোদীর নেতৃত্বাধীন সরকার এই বিষয়টিকে গুরুত্ব দিয়াই কৃষিক্ষেত্রের সার্বিক উন্নতি এবং কৃষকের জীবনযাত্রায় স্বাচ্ছন্দ্য আনিবার লক্ষ্যে সংসদে কৃষি বিল গ্রহণ করিয়াছে। সংসদে তিনটি বিল গ্রহণ করিয়া কৃষিক্ষেত্রে সার্বিক উন্নতির পক্ষে কয়েকটি পদক্ষেপ করিয়াছে কেন্দ্রীয় সরকার। প্রথম বিলটিতে কৃষিপণ্য বেচা-কেনা, কৃষি বাণিজ্যে উন্নতি এবং সরলীকরণের কথা বলা হইয়াছে। বলা হইয়াছে, এমন একটি পরিস্থিতি তৈয়ারি করা যাহাতে কৃষক স্বাধীনভাবে এবং স্বচ্ছন্দে কৃষক মান্ডির বাহিরেও তাহাদের উৎপাদিত পণ্য বিক্রয় করিতে পারে। বামপন্থীরা মিথ্যা ও বিকৃত প্রচার করিয়া বলিতেছে, সরকার মান্ডি তুলিয়া দিতে চাহিতেছে। কিন্তু এই বিলে কোথাও কৃষক মান্ডি তুলিয়া দিবার কথা বলা হয় নাই। বরং, কৃষক মান্ডির পাশাপাশি তাহার বাহিরেও উৎপাদিত পণ্য বিক্রয়ের অধিকার কৃষককে দেওয়া হইয়াছে। এতদ্ ব্যতীত বিভিন্ন প্রদেশে বাধাহীনভাবে কৃষিপণ্য ব্যবসায়ের সুযোগ সৃষ্টির কথাও বলা হইয়াছে। বাজারজাত ও পরিবহণ খরচ কমাইয়া কৃষকদের কৃষি পণ্যের সঠিক মূল্য পাইবার ব্যবস্থার কথাও বলা হইয়াছে। অর্থাৎ মধ্যস্বত্বভোগীদের বিলোপ করিয়া কৃষককে ফসলের ন্যায্য মূল্য দিবার লক্ষ্যেই বিলটি সংসদে গ্রহণ করা হইয়াছে। দ্বিতীয় বিলটিতে চুক্তিবদ্ধ চাষে কৃষকদের সুরক্ষা এবং ফসলের মূল্য নির্ধারিতকরণের কথা বলা হইয়াছে। এই প্রসঙ্গেও বামপন্থীরা ক্রমাগত মিথ্যা প্রচার করিতেছে। কিন্তু তাহারা একবারও বলিতেছে না, পূর্বতন কংগ্রেস সরকারের সময়েও চুক্তিচাষ ছিল। কিন্তু তখন কেন্দ্রীয় সরকার কৃষকের সুরক্ষা এবং ফসলের মূল্য নিশ্চিতকরণের কথা বলে নাই। নরেন্দ্র মোদীর নেতৃত্বাধীন সরকার এইবার তাহা করিয়াছে। তৃতীয় বিলটিতে বলা হইয়াছে, অত্যাবশ্যক পণ্যের তালিকা হইতে দানাশস্য, ডাল, তৈলবীজ ও আলু বাদ পড়িবে। এই পদক্ষেপ বেসরকারি ও বৈদেশিক পুঁজিকে কৃষিক্ষেত্রে বিনিয়োগে উৎসাহিত করবে। পাশাপাশি, কোল্ড স্টোরেজের মতো পরিকাঠামোতে পুঁজি বিনিয়োগ বৃদ্ধি পাইবে। ইহাতে বাজারে প্রতিযোগিতাও বাড়িবে এবং কৃষিজাত পণ্যের অপচয়ও রোধ করা যাইবে। তবে, এই বিলে ইহাও বলা হইয়াছে, কোনো সংকটজনক পরিস্থিতিতে ইহা নিয়ন্ত্রণ করিবার সম্পূর্ণ অধিকার সরকারের হস্তেই থাকিবে।

কেন্দ্রীয় সরকারের এই কৃষিবিলটি সার্বিকভাবে পর্যালোচনা করিলে ইহা বুঝিতে অসুবিধা হয় না যে, এই বিলটি কৃষক এবং কৃষিক্ষেত্রের উন্নতি সাধনেই প্রণীত হইয়াছে। এবং ইহাও বুঝিতে অসুবিধা হয় না, যাহারা এই বিলের বিরোধিতা করিতেছে, তাহারা নিতান্তও রাজনৈতিক উদ্দেশ্যেই করিতেছে। আত্মনির্ভর ভারত গঠন অপেক্ষা রাজনীতির মঞ্চ গরম করাই এই বিরোধীদের একমাত্র লক্ষ্য।

সুভাষিতম্

বিষাদপ্যমৃতং গ্রাহ্যং বালাদপি সুভাষিতম্।

অমিত্রাদপি সদ্বৃত্তম্ অমেধ্যাদপি কাঞ্চনম্।।

বিষ থেকে অমৃত গ্রহণ করা উচিত, ছোটোদের কাছ থেকেও ভালো কথা শোনা উচিত, শত্রুর কাছ থেকে নৈতিকতার শিক্ষা গ্রহণ করা উচিত এবং অপরিষ্কার স্থান থেকেও সোনা বেছে নেওয়া উচিত।

বাবরি মামলায় আডবাণীরা নির্দোষ প্রমাণিত হওয়ায় বামপন্থীদের বহুদিনের সাজানো মিথ ভেঙে পড়েছে

অভিমন্যু গুহ

বাবরি মামলার রায় ঘোষণার পর এই রায়ে যারা অখুশি হয়েছেন, অর্থাৎ হরেক কিসিমের বামপন্থীরা, তাদের কাছ থেকে যে প্রতিক্রিয়াগুলি পাওয়া যাচ্ছিল তা দেখে মনে হয় এরা আশা করেছিলেন লালকৃষ্ণ আডবাণীর মতো ভারতীয় রাজনীতির এক প্রবীণ নেতাকে ফাঁসিতে লটকানো হবে আর তাঁর সহযোগী অভিযুক্ত মুরলীমনোহর যোশী-সহ আরও যে ২৭ জন রয়েছেন তাঁদেরও ফাঁসি অবশ্যম্ভাবী। তা না হওয়ায় যে প্রতিক্রিয়া উঠে এসেছে রাজ্যের বামপন্থী পরিচালিত সংবাদপত্র এবং সোশ্যাল মিডিয়ায়, সেটা খুব গুরুত্বপূর্ণ কিছু প্রশ্ন তুলে দিয়েছে। পশ্চিমবঙ্গের একটি তথাকথিত প্রথম সারির দৈনিক স্বতঃপ্রণোদিতভাবে আডবাণীর একটি কঠিন মুখের ছবি ছাপিয়ে পাশে লিখেছে, 'বাবরিতে বেকসুর ৩২ জনই'।

সাধারণত কোনো দাগি আসামির সাজা রদ হলে 'বেকসুর' কথাটি ব্যবহৃত হয়। লালকৃষ্ণ আডবাণী, যিনি ভারতীয় সংসদে বহু গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব পালন করেছেন ও দেশের প্রাক্তন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীও এবং সৎ ব্যক্তিত্ব হিসেবে ভারতীয় রাজনীতিতে দুর্লভ কৃতিত্বের অধিকারী; তাঁকে প্রকারান্তেরে দাগি আসামি বলার অধিকার মাওবাদী সম্পাদকমণ্ডলী পরিচালিত ওই সংবাদপত্রকে কে দিয়েছে, এই প্রশ্ন কিন্তু উঠবেই। আরও একটা কথা, এই শব্দের প্রয়োগ কী গভীর হতাশা প্রসূত। সুতরাং হতাশার কারণ খোঁজাও দরকার। আদালতের রায় ঘোষণার পরই সোশ্যাল মিডিয়ায় হ্যাশট্যাগ দিয়ে লেখা হতে থাকলো, 'রিমুভ বিজেপি চ্যালেঞ্জ'। এর অর্থ কী ভগবানই জানেন, কিন্তু কিছুটা অনুমান করা যায়। বিগত কিছুদিন যাবৎ বিচারের রায় অপছন্দ হলেই বিচার ব্যবস্থাকে যে নগ্ন, কদর্য আক্রমণের শিকার হতে হচ্ছিল, বিচারপতিদের চরিত্র হনন করা হচ্ছিল, ভারতের গণতান্ত্রিক কাঠামোই দুর্বল করে দেওয়া হচ্ছিল, এও তার একটি পদ্ধতিগত ধাপ। এখন দেখা যাক, আদালতের রায়ের মোদ্দাকথা কী। সবাই জানেন, রামমন্দির নির্মাণের পক্ষে রায় দিতে গিয়ে আদালত বলেছিল, বাবরি ধাঁচা (আসলে মসজিদের ন্যায় একটি কাঠামো) ভাঙা অপরাধ হয়েছে। কিন্তু গত ৩০ সেপ্টেম্বরের রায়ে আদালত প্রকারান্তরে স্বীকার করে নিয়েছে যে, গণরোষের কারণেই এই মসজিদের মতো কাঠামোটির পঞ্চত্ব প্রাপ্তি ঘটেছে। আদালত আইনি মোড়কে এই গণরোষকারীদের চিহ্নিত করেছে 'সামাজবিরোধী করসেবক' রূপে। তবে এদের উস্কানিতে অভিযুক্ত নেতৃত্বের যে কোনো হাত ছিল না তাও স্পষ্টাক্ষরে বলেছে। আসলে সংসদীয় গণতন্ত্রে থাকতে গেলে কিছু গণতান্ত্রিক রীতিনীতি মানতে হয়। দেশের ওপর, দশের ওপর বারবার আঘাত সত্ত্বেও যাঁরা দেশকে ভালোবাসেন তাঁরা এই নীতি থেকে সরেননি, হয়তো দেশকে নিঃস্বার্থভাবে ভালোবাসার কারণে। যার সুযোগ দেশদ্রোহী কমিউনিস্টরা বারবার নিয়েছে এবং এখনো নিচ্ছে। তাই সেদিনের দায়িত্বশীল নেতৃত্ববৃন্দ সেদিন তো প্ররোচনামূলক কিছু বলেনইনি, বরং উত্তেজিত করসেবকদের বিরত করতেই তাঁরা চেষ্টা করছিলেন। কিন্তু মুষ্টিমেয় নেতৃত্ব আর দেশাত্মবোধে উদ্বুদ্ধ অগণিত করসেবক। স্বাভাবিকভাবেই ভারতের পাঁচশো বছরের পরাধীনতার চিহ্ন নিমেষে অপসারিত হয়েছিল। আদালতও হয়তো গণতান্ত্রিক কাঠামো মেনেই এঁদের 'সমাজবিরোধী করসেবক' বলে দাগিয়েছেন। কারণ কোনো জিনিস একবার গড়লে তা এদেশের গণতান্ত্রিক কাঠামোয় ভাঙা খুব মুশকিলের। বিশেষত, যেখানে কায়েমি স্বার্থ কাজ করে, সংখ্যালঘুদের অধিকার আখ্যা দিয়ে দেশের মানুষকে বৃহত্তর ষড়যন্ত্রের শিকার হতে হয়। কিন্তু আইনের গণ্ডিতে যাঁরা আবদ্ধ নেই, দেশের সেই গণণিত জনগণ তাই বিশ্বাস করেন, ভারতবর্ষের পাঁচশো বছরের পরাধীনতার চিহ্ন যাঁরা অপসারিত করেছেন, তাঁরা চরিত্রবলে কতটা উন্নত।

যাইহোক, এই রাজ্যের বামপন্থীদের একটা মস্ত সুবিধা আছে, তারা যখন যেমন

> **পাকিস্তান- চীনের মতো পররাষ্ট্রের দালালিই আপাতত বামপন্থীদের ভবিতব্য। শরিয়তি আইনের পক্ষাবলম্বীরা ছাড়া সকল মুসলমান রামমন্দিরের পক্ষে। কোনো সভ্য সমাজে শরিয়তি শাসন চলতে পারে না, কোনো গণতান্ত্রিক কাঠামোয় বামপন্থার প্রবেশ ঘটলে তার ভিত নড়বড়ে তো হবেই।**

তখন তেমন ‘বিশেষজ্ঞে’র ভেক ধরতে পারে। যেমন যখন প্রথম প্রথম করোনার প্রাদুর্ভাব হচ্ছিল, তখন তারা ভাইরোলোজিস্ট হয়ে পরামর্শ দিচ্ছিলেন। তারপর আমফানের সময় ডিজাস্টার ম্যানেজমেন্ট বিশেষজ্ঞ হয়ে গেলেন। কিছুদিন আগে তারা কৃষি-বিশেষজ্ঞে রূপান্তরিত হয়েছিলেন। বাবরি-রায় ঘোষণার পরে এখন তারা হয়ে গিয়েছেন আর্কিওলজি-বিশেষজ্ঞ। সুতরাং তারা বিশেষজ্ঞের ভঙ্গিতে প্রশ্ন করছেন, ওখানে আদৌ রামলালার অস্তিত্ব ছিল কিনা, তিনি জন্মেছিলেন কিনা, তাঁর জন্মস্থান চিহ্নিত হলো কীভাবে ইত্যাদি। পুরনো এক কথা আর ঘেঁটে লাভ নেই, যা উত্তর দেবার অর্কিওলজিক্যাল সোসাইটি অব ইন্ডিয়ার বিশেষজ্ঞরা দিয়ে দিয়েছেন। এবং তাঁদের বামপন্থীদের মতো অগাধ পাণ্ডিত্য না থাকতে পারে, কিন্তু এ বিষয়ে পাণ্ডিত্য বামপন্থীদের থেকে কিছু বেশি বলেই সাধারণের ধারণা। তাছাড়া পুরাণ, লোককথার প্রমাণের কথা তো ছেড়েই দিলাম। মার্কসবাদ নামক অপবিজ্ঞানে যারা বিশ্বাসী, তারা তো ভারতীয় ইতিহাসের স্বাভাবিক সূত্রগুলিকে অস্বীকার করবেই।

আসলে বিষয়টা ওসব নিয়ে নয়। বিষয়টা মুখ্যত রাজনৈতিক এবং গৌণত রাজনৈতিক। ইতিহাস অনুযায়ী, বাবরি নির্মিত হয়েছিল এদেশ লুণ্ঠনকারী, পরে ক্ষমতা দখলকারী, মধ্যপ্রাচ্যের বিদেশি শাসকদের বিজয়-নিশান হিসেবে। ফলে ভারতবর্ষের পরাধীনতার এই প্রতীকটিকে দেশের খণ্ডিত স্বাধীনতার সময়ই হয়তো অপসারিত করা দরকার ছিল। তখন স্লোগান ওঠে ‘হাসকে হাসকে পাকিস্তান— লড়কে লেঙ্গে হিন্দুস্থান’। হাসতে হাসতে পাকিস্তান হাসিল হলেও, হিন্দুস্থান হাসিল করার কাজটা সহজ ছিল না। কারণ প্রথমত, শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের মতো দৃঢ়চেতা নেতার আবির্ভাব, তাঁকে সরিয়ে দিয়ে যাও-বা পথ নিষ্কণ্টক হলো, বাদ সাধল রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘ নামক দেশের প্রশ্নে আপোশহীন একটি সংগঠন। যাদের জন্য বহু চেষ্টা করেও ‘লড়কে লেঙ্গে হিন্দস্থান’ হাসিল করতে পারা যাচ্ছিল না। ফলে আরএসএস-জুজুর বিশেষ প্রয়োজন ছিল, যখন ভারতের এই পরাধীনতার চিহ্ন ধ্বংস হয়ে গেল, তখন হাসকে হাসকে পাকিস্তানপন্থীরা দেখল মহাবিপদ। এখনই কিছু না করলে ভারতে তাদের অস্তিত্ব সংকটে তো পড়বেই, মৌরুসিপাট্টারও অবসান ঘটবে। তাদের এতকাল সযত্নলালিত ভারত দখলের স্বপ্নও তো ভেস্তে যায় যায় অবস্থা। এমনিতে ভারতের রাজনৈতিক পরিস্থিতিটাও তখন বিশেষ সুবিধার ঠেকছিল না তাদের কাছে। এদের বিশ্বস্ত রাজনৈতিক প্রভুদের অর্থাৎ গান্ধী-নেহরু পরিবারের , যারা ভাবতেন ভারত তাদের পৈত্রিক জমিদারি, সেই একদা দোর্দণ্ডপ্রতাপ একচ্ছত্র আধিপত্যে তখন ঘুণ ধরেছে, শাসন ক্ষমতায় পিভি নরসিমা রাও, ক্ষমতার ছড়িও আর গান্ধী-নেহরু পরিবারের হাতে নেই। তার ওপর পরাধীন ভারতের প্রতীক স্তম্ভ, যাকে ভারতের নিজস্ব স্থাপত্য কীর্তির প্রতীক বলে চালানোর চেষ্টা হচ্ছিল, যাতে মধ্যপ্রাচ্যের লুঠেরা, বহিরাগতরা প্রকৃত ভারতীয় বলে স্বীকৃত হন। সেই সুযোগে ‘লড়কে লেঙ্গে পাকিস্তান’- পন্থীদের ‘হাসকে হাসকে হিন্দুস্থানে’র উদ্দেশ্য সফল হয়। এই পরিকল্পনার অংশ হিসেবেই লালকৃষ্ণ আডবাণী, মুরলীমনোহর যোশী-সহ বাকি নেতৃবৃন্দকে কাঠগড়ায় তোলার চেষ্টা, সামাজিকভাবে একঘরে করার উপলক্ষ্য, দাগি আসামি হিসেবে বদনাম দিয়ে আসলে ওই জুজুটাকেই ঝালিয়ে নেওয়ার চেষ্টা হচ্ছিল। তার পরিসমাপ্তিতে বামপন্থীদের গাত্রদাহ তো হবেই। বামপন্থীরা ভুলে যাচ্ছেন, মানুষকে কিছুদিন ভুল বোঝানো যায়, কিন্তু চিরদিনই তাদের ভুল বুঝিয়ে রাখবেন এটা ভেবেই তারা মূর্খের স্বর্গে বাস করেছেন। স্বাধীনতার ৪৫ বছর ভুল বোঝানোয় মানুষের ধৈর্যের বাঁধ ভেঙেছিল, তারপর কিছুদিন ধরে নানাবিধ অপপ্রচার চলল, ক্ষমতা থেকে জাতীয়তাবাদী শক্তিকে দূরে সরিয়ে রাখার সেই পুরনো খেলা চলল, কিন্তু বামপন্থীরা এটা বুঝলো না বেশিদিন এটা করতে গেলে ভারতবর্ষের মানুষ একদিন ঠিকই ধরে ফেলবেন। সেদিন কিন্তু ভারতে বামপন্থার অস্তিত্ব সংকট হবে। আজ ঠিক তাই হচ্ছে। বামপন্থীদের সবচেয়ে বড়ো ভুল রামমন্দিরকে পলিটিক্যাল ইস্যু হিসেবে দেখা। ভারতের শাশ্বত সংস্কৃতির সঙ্গে যে এই মন্দিরের অস্তিত্ব জড়িয়ে আছে, এটা বামেরা বোঝেনি তা নয় , কিন্তু সব জেনে বুঝেও কোনো কায়েমি স্বার্থে এতদিন ভারতবাসীকে বিপথে চালনা করেছে, আজকে এদেশের মানুষের কাছে তো তার জবাবদিহি তো করতে হবেই।

ভুল বোঝানোর খেলাটা এখনো চলছে। কিছু হলেই সেকুলারিজমের দোহাই পারা বামপন্থীদের পুরনো ব্যাধি। কিন্তু বামপন্থার এই অ্যাজেন্ডা বর্তমান ভারতে অচল। সেকুলারিজম নামক দুর্বোধ্য শব্দের প্রভাব স্বাধীনতার আগে পূর্ববঙ্গের নোয়াখালি দেখেছে। আজও সেই ঘটনাকে বামপন্থীদের তাত্ত্বিক সমর্থন করতে মানুষ যখন দেখে তখন সেকুলারিজমের অন্তর্নিহিত অর্থটাও তাঁরা হাড়ে হাড়ে বুঝতে পারেন। ৩৪ বছরের বাম শাসনে তো গ্রামবাঙ্গলার কোণে কোণে সেকুলারিজমের কেমন চাষ হয়েছে, সেই অভিজ্ঞতা পশ্চিমবঙ্গের মানুষ এখনও ভোলেননি। তৃণমূল শাসন শুধু বামপন্থীদের সেই ‘সেকুলারিজম’ নীতির পরবর্তী ধাপ মাত্র।

মুসলমান সম্প্রদায়ের বহু মানুষও রামমন্দিরকে সমর্থন করেছেন, কারণ তাঁরা তাঁদের শিকড় এখানে প্রোথিত বলে তাঁরা মনে করেন। ভারতের মুসলমানদের উপাসনা পদ্ধতি মধ্যপ্রাচ্য থেকে আমদানি করা, এটা প্রমাণের তাগিদ বামপন্থীদের আরও বিপদে ফেলবে। ঠিক যেমন দেশের মানুষের শিকড় উপড়ে ফেলার চেষ্টা করে নেহরুর কংগ্রেস আজ প্রায় নির্মূল, ভারতীয় রাজনীতিতে এখন তাদের ভূমিকা প্যারাসাইটের মতো। বামপন্থীদের সেটুকু ক্ষমতাও নেই। পাকিস্তান- চীনের মতো পররাষ্ট্রের দালালিই আপাতত তাদের ভবিতব্য। শরিয়তি আইনের পক্ষাবলম্বীরা ছাড়া সকল মুসলমান রামমন্দিরের পক্ষে। কোনো সভ্য সমাজে শরিয়তি শাসন চলতে পারে না, কোনো গণতান্ত্রিক কাঠামোয় বামপন্থার প্রবেশ ঘটলে তার ভিতও নড়বড়ে তো হবেই। ■

নয়া কৃষি বিল ২০২০
গ্রামীণ অর্থনীতিতে জোয়ার আনবে

সুদীপ নারায়ণ ঘোষ

ক্ষুদ্র ও প্রান্তিক কৃষক আমাদের মোট কৃষকের ৮৬ শতাংশ। তারা নিজেদের উৎপাদিত কৃষিপণ্যের ভালো দাম পাওয়ার জন্য দরকষাকষি করতে পারে না বা কৃষিখেতের উৎপাদন বাড়ানোর উদ্দেশ্য প্রযুক্তিগত পরিকাঠামোয় বিনিয়োগ করতে পারে না, তাদের সেই সুযোগ নেই। এতদিন অন্তত ছিল না। এবার আসবে। প্রস্তাবিত কৃষি অইনের মূল বিধানে তাদের সাহায্য করার ব্যবস্থা রাখা হয়েছে।

কৃষি বিপণনবিষয়ক বিলটি কৃষকদের এপিএমসি (কৃষিপণ্য বিপণন সমিতি) দ্বারা গঠিত মান্ডির বাইরে যাকে ইচ্ছে তাকে তাদের উৎপাদিত পণ্য বিক্রয় করার অনুমতি দিয়েছে। যে কেউ তাদের খামারের দোরগড়ায় এসেও তাদের উৎপাদিত পণ্য কিনতে পারবে। যদিও 'মান্ডি' ও রাজ্যগুলোর 'কমিশন এজেন্ট' সোজা কথায় ফড়ে, দালালরা তাদের কমিশন ও মান্ডি ফি হারাতে পারে (বর্তমানে প্রতিবাদের মুখ্য কারণ এটাই) কিন্তু কৃষকরা প্রতিদ্বন্দ্বিতামূলক বাজার ও পরিবহণ ব্যয় লাঘবের কারণে ভালো দাম পাবে।

যে সব বিধান ওই বিলে আছে তা হলো :

- এমন একটা আর্থিক ব্যবস্থা কায়েম করা যেখানে কৃষক ও ব্যবসায়ীরা রাজ্যের এপিএমসির অধীনস্থ নিবন্ধীকৃত 'মান্ডি'র বাইরে তাদের উৎপাদিত পণ্য বিক্রয় ও ক্রয় করার স্বাধীনতা পাবে।
- কৃষকদের উৎপাদিত পণ্য আন্তঃরাজ্য ও রাজ্যমধ্যস্থ অংশে অবাধ চলাচলে প্রোৎসাহন দেওয়া।
- ভালো দাম পাওয়ার জন্য বিপণন ও পরিবহণ ব্যয় কমানো।
- বৈদ্যুতিন ব্যবসার সুবিধাজনক কাঠামো প্রদান করা।

বিরোধিতার কারণ :

- রাজ্যগুলো রাজস্ব হারাবে কারণ যদি কৃষকরা তাদের পণ্য নিবন্ধীকৃত এপিএমসি বাজারের বাইরে বিক্রি করে তাহলে তারা 'মান্ডি ফি' সংগ্রহ করতে পারবে না।
- রাজ্যগুলোতে কমিশন এজেন্টদের কী হবে যদি মান্ডির বাইরে সমস্ত বাণিজ্য চলে যায়?

সবিস্তারে উত্তর :

লোকসভায় ২১ সেপ্টেম্বর ২০২০ কৃষকদের আয় বৃদ্ধি এবং কৃষিক্ষেত্রে সংস্কারের উদ্দেশ্যে দুটি বিল অনুমোদিত হয়েছে। ২০২০-র কৃষিপণ্য ব্যবসা-বাণিজ্য (উৎসাহদান) বিল এবং ২০২০-র কৃষক (ক্ষমতায়ন ও রক্ষা) মূল্য নিশ্চিতকরণ। কৃষি পরিষেবা বিল দুটি ১৪ তারিখ কেন্দ্রীয় কৃষি ও কৃষককল্যাণ, গ্রামোন্নয়ন ও পঞ্চায়েতি রাজ মন্ত্রী নরেন্দ্র সিংহ তোমর পেশ করেন। এ সংক্রান্ত ৫ জুনের অধ্যাদেশটিকে আইনে পরিণত করতে এই বিল পেশ করা হয়েছিল।

২০২০-র কৃষিপণ্য ব্যবসা-বাণিজ্য (উৎসাহদান) বিল :

এই বিলের মাধ্যমে কৃষকরা তাঁদের উৎপাদিত সামগ্রীর ভালো দাম যেখানে পাবেন সেখানেই বিক্রি করতে পারবেন। এর ফলে, দক্ষ, স্বচ্ছ এবং বাধাহীন ভাবে কৃষিপণ্যের ব্যবসা-বাণিজ্য রাজ্যের অভ্যন্তরে এবং এক রাজ্য থেকে অন্য রাজ্যে করা যাবে।

নতুন এই ব্যবস্থার ফলে বিভিন্ন রাজ্যের মধ্যে কৃষকরা বৈদ্যুতিন প্রক্রিয়ায় ব্যবসা-বাণিজ্য করার সুযোগ পাবেন।

প্রেক্ষাপট :

ভারতের কৃষকরা তাঁদের উৎপাদিত পণ্যের বিক্রির সময় বিভিন্ন বিধিনিষেধের সম্মুখীন হয়ে থাকেন। কৃষকরা প্রজ্ঞাপিত কৃষিপণ্য বাজার কমিটি ছাড়া অন্য কোথাও তাঁদের উৎপাদিত শস্য বিক্রি করতে পারতেন না। রাজ্য সরকারের নিবন্ধীকৃত সংস্থার কাছেই তাঁরা তাঁদের উৎপাদিত সামগ্রী বিক্রি করতেন। এর ফলে, এক রাজ্য থেকে অন্য রাজ্যে কৃষিপণ্য বিক্রির ক্ষেত্রে সমস্যা দেখা দিত।

সুবিধা :

নতুন আইনের ফলে কৃষক এবং ব্যবসায়ীরা তাঁদের পছন্দমতো কৃষিপণ্য বিক্রি করতে ও কিনতে পারবেন। রাজ্য কৃষিপণ্য বিপণন আইনের আওতায় নির্দিষ্ট বাজারগুলি ছাড়াও কৃষকরা এখন থেকে রাজ্যের অভ্যন্তরে যে কোনও বাজারে অথবা রাজ্যের বাইরে তাঁদের উৎপাদিত সামগ্রী বিক্রি করতে পারবেন। এই ঐতিহাসিক পদক্ষেপের ফলে দেশে নিয়ন্ত্রিত কৃষি বাজারের অবসান ঘটবে। কৃষকরা তাঁদের পণ্য বিপণনের ব্যয় কমাতে পারবেন

এবং আরও ভালো দেশে নিয়ন্ত্রিত কৃষি বাজারের অবসান ঘটবে। কৃষকরা তাঁদের পণ্য বিপণনের ব্যয় কমাতে পারবেন এবং আরও ভালো দাম পাবেন। তাঁরা তাঁদের অতিরিক্ত ফসল যে জায়গায় বেশি ভালো দাম পাবেন সেখানে বিক্রির সুযোগ পাবেন। এই বিল বৈদ্যুতিন প্রক্রিয়ায় বাধাহীনভাবে কৃষিপণ্য বেচা-কেনার ক্ষেত্রে সুযোগ করে দিয়েছে। এই আইনের ফলে কৃষকদের উৎপাদিত পণ্য বিক্রির সময়ে কোনও সেস বা লেভি দিতে হবে না। কোনও বিবাদ দেখা দিলে তা মেটানোর জন্য নির্দিষ্ট ব্যবস্থাপনাও গড়ে তোলা হবে।

‘এক ভারত এক কৃষি বাজার’ ঃ

কৃষিপণ্য বিপণন কমিটির নিয়ন্ত্রিত বাজারগুলি ছাড়াও কৃষকরা যাতে ভালো দামে তাঁদের ফসল অন্য জায়গায় বিক্রি করতে পারেন, এই বিলের মাধ্যমে সেই অধিকার তৈরি হলো। ন্যূনতম সহায়ক মূল্যে কৃষিপণ্য বিক্রির পাশাপাশি, কৃষকদের আয়ের নতুন একটি পন্থা এর থেকে তৈরি হলো। এর সাহায্যে ‘এক ভারত এক কৃষি বাজার’ ব্যবস্থা গড়ে উঠবে যার ফলে আমাদের দেশের কঠোর পরিশ্রমী কৃষকরা তাঁদের উৎপাদিত সামগ্রীর ভালো দাম পাবেন।

২০২০-র কৃষক (ক্ষমতায়ন ও রক্ষা) মূল্য নিশ্চিতকরণ এবং কৃষি পরিষেবা বিল :

এই বিলের সাহায্যে কৃষি সংক্রান্ত চুক্তির ক্ষেত্রে একটি জাতীয় স্তরের পরিকাঠামো গড়ে উঠবে যার মাধ্যমে কৃষকরা কৃষিভিত্তিক বাণিজ্যিক সংস্থা, প্রক্রিয়াকরণ শিল্প, পাইকার, রপ্তানিকারক এবং বৃহৎ খুচরো ব্যবসায়ীদের সঙ্গে তাঁদের উৎপাদিত সামগ্রী বিক্রির ক্ষেত্রে চুক্তি করতে পারবেন।

প্রেক্ষাপট :

ভারতীয় কৃষিক্ষেত্রে সাধারণত কৃষকদের কম জমি থাকে। এছাড়াও, আবহাওয়ার ওপর নির্ভর করে থাকার জন্য কৃষকরা নানা সমস্যার সম্মুখীন হন। কৃষিপণ্য উৎপাদনের ক্ষেত্রে নানা ভাবে অনিশ্চয়তা দেখা দেয় এবং বাজারের অনিশ্চিত দামের ফলে কৃষকরা ক্ষতির সম্মুখীন হন। এ কারণে কৃষিক্ষেত্রে চাষাবাদ করার সময় এবং ফসল উৎপাদনের পর পুরো প্রক্রিয়াটি অত্যন্ত ঝুঁকিপূর্ণ এবং অদক্ষ বলে বিবেচিত হয়ে থাকে।

সুবিধা :

নতুন অইনের সাহায্যে কৃষকরা প্রক্রিয়াকরণ শিল্প সংস্থা, পাইকার, বৃহৎ খুচরো ব্যবসায়ী, রপ্তানিকারক ইত্যাদিদের সঙ্গে কোনও আশঙ্কা ছাড়াই চুক্তি করতে পারবে না। এর ফলে, বাজারে অনিশ্চয়তা সম্পর্কে কৃষকের যে ভয় থাকে তা দূর হবে।

কৃষক আধুনিক প্রযুক্তি ব্যবহার করে কৃষিপণ্য বিপণনের মধ্য দিয়ে খরচ কমাতে পারবেন এবং তাঁর আয় বৃদ্ধি হবে।

নতুন এই আইনের সাহায্যে কৃষিক্ষেত্রে বেসরকারি বিনিয়োগ বাড়বে। ভারতীয় কৃষিপণ্যের দেশে-বিদেশে রপ্তানি শৃঙ্খল তৈরির ক্ষেত্রে এবং কৃষিক্ষেত্রে পরিকাঠামো গড়ে তুলতে বেসরকারি সংস্থাগুলি উৎসাহিত হবে।

কৃষকরাও প্রযুক্তি ব্যবহারের সুযোগ পাবেন এবং এর ফলে তাঁদের উৎপাদিত পণ্য যথাযথ দামে বিক্রি করতে পারবেন। সরাসরি নিজের

নরেন্দ্র সিংহ তোমর, কেন্দ্রীয় কৃষি মন্ত্রী

- কৃষকরা এখন থেকে তাঁদের উৎপাদিত সামগ্রী নির্দিষ্ট বাজারের পরিবর্তে যে কোনও জায়গায় বিক্রি করতে পারবেন।
- ন্যূনতম সহায়ক মূল্যের সুবিধা পাবেন।
- রাজ্যের আইন অনুসারে যে কৃষি বাজারগুলি রয়েছে সেখানেও কেনা-বেচা চলবে।
- এর ফলে সরবরাহ-শঙ্খল এবং কৃষি পরিকাঠামোর উন্নতি হবে, কর্মসংস্থান বৃদ্ধি পাবে।
- কৃষকরা এখন অন্যের উপর নির্ভরশীল না হয়ে বড়ো বড়ো খাদ্যপ্রক্রিয়াকরণ কোম্পানির সঙ্গে চুক্তি করে অনেক বেশি লাভ করতে পারবে, চুক্তি কৃষকদের পূর্বনির্ধারিত মূল্য পেতে সাহায্য করবে।
- কিন্তু চুক্তির দ্বারা কৃষকদের স্বার্থের বিরুদ্ধে কিছু করা যাবে না। কোনোরকম জরিমানা না দিয়ে চুক্তি থেকে বেরিয়ে আসার বিষয়ে কৃষকদের স্বাধীনতা থাকবে।
- বিলে খুব স্পষ্টভাবে বলা আছে যে কৃষকদের জমি বিক্রি, লিজ ও বন্ধক সম্পূর্ণভাবে নিষিদ্ধ, চুক্তি শুধুমাত্র ফসলের উপর হবে, জমির উপর নয়।
- একাধিক রাজ্যে কৃষকরা বড়ো বড়ো বাণিজ্যিক সংস্থার সঙ্গে সহযোগিতায় আখ, তুলা, চা, কফি উৎপাদন করছে। ছোটো চাষীরাও আগের থেকে বেশি সুবিধা পাবেন এবং তাঁরাও প্রযুক্তি ও যন্ত্রপাতির জন্য ব্যাঙ্ক ঋণ পাবেন।

পণ্যসামগ্রী বিক্রি করার সুযোগ তৈরি হওয়ায় মধ্যস্বত্বভোগীদের এড়িয়ে কৃষক তাঁর পুরো ফসলের যথাযথ দাম পারেন। এছাড়াও, কৃষিপণ্য বিক্রি, কৃষি জমির লিজ অথবা বন্ধক সংক্রান্ত ক্ষেত্রে যেসব সমস্যা দেখা দিত তা দূর হবে এবং কোনও বিবাদের সম্মুখীন হলে সুস্পষ্ট নীতি মেনে সমস্ত অভিযোগের নিষ্পত্তি হবে।

কৃষকদের গরিব রাখতে ফড়েরাজ চালু করেছিল কংগ্রেস। কৃষক আন্দোলনের নামে লোকখেপানোর কাজ করেছে বামেরা। ফড়েদের থেকে টাকা নিয়ে তাদের পুষেছে বাম, এখন তৃণমুল। যত কৃষক অসন্তুষ্ট তত তাদের দিয়ে আন্দোলন চালানো সহজ। ফড়েরাজ খতম হলে বাম কৃষক সংগঠনের আর কোনো কাজ থাকবে না তাই সমস্যা জিইয়ে রাখতে মিথ্যা প্রচার করো, নতুন কৃষি বিলের বিরোধিতা করো, আদালতে মামলা করো। কৃষক যদি একবার তাদের অধিকার বুঝে নিতে পারে খতম হয়ে যাবে বাম-কংগ্রেসের ধান্দাবাজির রাজনীতি। তাই আদাজল খেয়ে নতুন কৃষি বিলের বিরোধিতায় নেমে পড়েছে গরিবের চিরশত্রু বাম-কংগ্রেস, এরা কোনোদিন আলাদা ছিল না।

কৃষিবিল লোকসভা ও রাজ্যসভা উভয়ই পাশ করেছে। কৃষি বিল হলো ডিমনিটাইজেশন দ্বিতীয় অংশ ডিমনিটাইজেশন যেমন নেস্টরকে অর্থাৎ, যে কালোটাকার মজুদ রেখেছিল, তাকে ধ্বংস করেছিল একইভাবে, পঞ্জাব ও মহারাষ্ট্রের দুটি হেভিওয়েট মজুতদারদের প্রতিপত্তি এই বিলে নষ্ট হয়েছে। পঞ্জাবের সুখবীর বাদল এবং মহারাষ্ট্রের শারদ পাওয়ারের প্রাণ উড়ে গেছে। 'সুখবীর অ্যাগ্রো'র বার্ষিক আয় ছিল কমপক্ষে ৫০০০ কোটি টাকা। তিনি এফসিআই এবং কৃষকদের মধ্যে কমিশন এজেন্ট ছিলেন। তার সংস্থা ২.৫ শতাংশ পেত। সমস্ত গুদাম তাঁরই। কোনও কৃষক সুখবীর অ্যাগ্রোর ট্যাগ ছাড়া এফসিআইয়ের কাছে এক টন গম বিক্রি করতে পারত না। সবই এক ঝটকায় বন্ধ হলো। পওয়ার-কন্যা সুপ্রিয়া সুলে ১ কোটি টাকার কৃষি আয় দেখাতেন। এই পরিবারের পুরো পেঁয়াজ, লঙ্কা ও আঙুরের ব্যবসায়ের নিয়ন্ত্রণ ছিল।

আগামী নির্বাচনে অকালি দল ও এনসিপিকে পথে বসতে হবে। ∎

বিজ্ঞপ্তি

স্বস্তিকার সকল গ্রাহক ও প্রচার প্রতিনিধিদের অনুরোধ করা যাচ্ছে যে, তাঁরা যেন তাঁদের দেয় টাকা নিম্নবর্ণিত ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টে **NEFT**-র মাধ্যমে সরাসরি জমা দেন। যে কোনো ব্যাঙ্কের শাখা থেকে টাকা পাঠাতে পারেন।

টাকা পাঠিয়ে স্বস্তিকা দপ্তরে অবশ্যই জানাবেন।

ফোন : ৮৬৯৭৭৩৫২১৪,
৮৬৯৭৭৩৫২১৫,
হোয়াটস্ অ্যাপ নম্বর : ৮৬৯৭৭৩৫২১৪

Account Name : **OMSWASTIK PRAKASHAN PVT. LTD.**
A/C. No. : **917020084983100**
IFSC Code : **UTIB0000005**
Bank Name :
AXIS Bank Ltd.
Branch : **Shakespeare Sarani Kolkata-71**

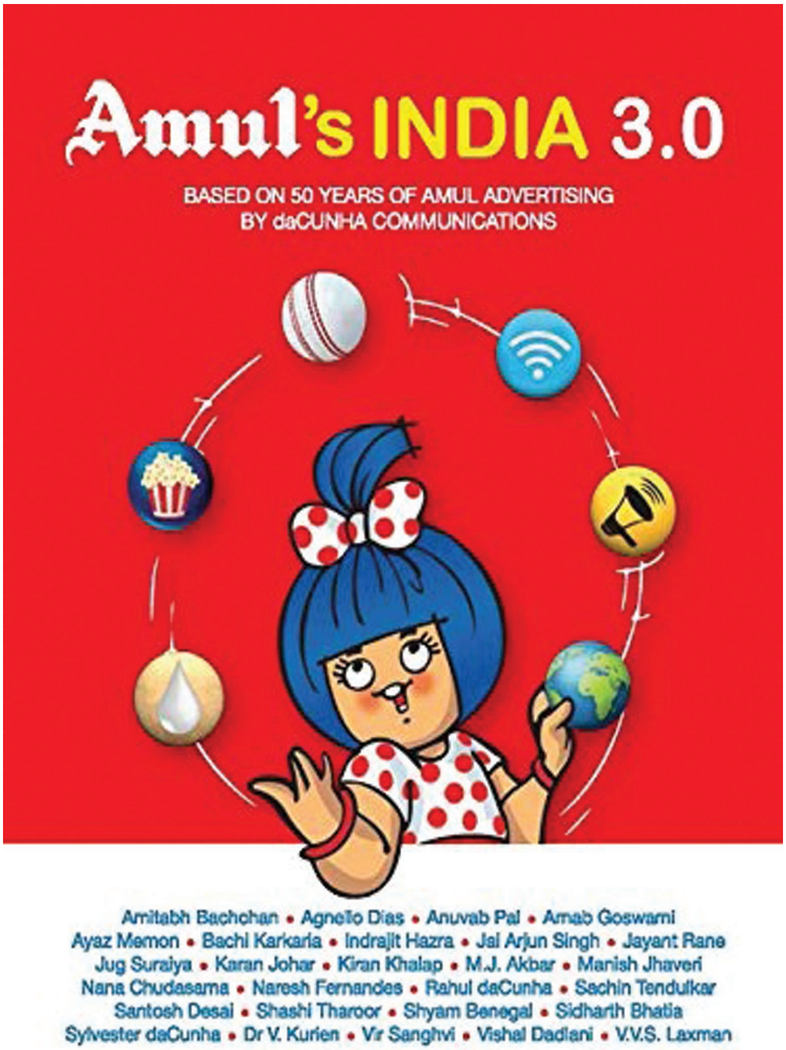

কৃষি বিলে ক্ষতি কার ?

ড. নারায়ণ চক্রবর্তী

স্বাধীনতার পর থেকে কৃষকদের স্বার্থে একাধিক বিল দেশের পার্লামেন্টে পাশ হলেও কৃষকদের অর্থনৈতিক অবস্থা, বিশেষত, ভাগচাষি ও ক্ষুদ্র এবং প্রান্তিক চাষিদের অবস্থা উত্তরোত্তর খারাপ হয়েছে। চাষযোগ্য ও চাষের জমির চরিত্র পালটে প্রোটারির রমরমা বেড়েছে, বিশেষত পশ্চিমবঙ্গে। কৃষকদের একটার বড়ো অংশ পরিযায়ী শ্রমিকের রূপান্তরিত হয়েছে। মধ্যসত্তভোগীদের বাড়বাড়ন্ত ধীরে ধীরে বৃদ্ধি পেয়েছে। রাজনৈতিক শাসককুল 'কাটমানি' নৈবেদ্যে পুজো পেয়েছে আর বিশেষ বিশেষ সময়ে ভোটের তাগিদে কৃষকের জন্য কুম্ভীরাশ্রু বিসর্জন করেছে। কেউ কেউ কৃষক খেপিয়ে মিছিল করেছে। ভোটের স্বার্থে রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাঙ্কগুলিকে দুর্বল করে 'ঋণমকুব' করিয়েছে, যা আদতে মধ্যস্বত্বভোগীও চাষের দাদন দেওয়া কুলাক শ্রেণীরই স্বার্থরক্ষা করেছে। কিন্তু এই প্রথমবার এমন তিনটি বিল পার্লামেন্টে পাশ হলো যাতে জমির উপর কৃষকের অধিকার ও কৃষকের নিজের ফসল নিজের দামে দেশের যে কোনো প্রান্তে বিক্রির অধিকার প্রতিষ্ঠিত হলো। প্রথমে বিলগুলির উল্লেখযোগ্য দিকগুলি আলোচনা করছি। তারপর বিরোধীদের এই বিলের বিরোধিতার কারণ ব্যাখ্যা করব।

Farmers' (Empowerment and Protection) Agreement on Price Assurance and Farm Services Bill 2020.

১. কৃষি চুক্তি যা কৃষককে কৃষি ব্যবসায়ী, ফড়ে, দালাল, হোলসেলারদের থেকে সুরক্ষা দেবে।

২. কৃষকদের সুরক্ষা দেওয়া, তাদের আয় বাড়ানোর জন্য ওপেন প্রাইসিং এবং কৃষির উন্নতির জন্য আইন প্রণয়ন।

৩. ভাগচাষিদের স্বার্থ ক্ষুণ্ণ না করে কৃষকদের সঙ্গে কৃষি ব্যবসায়ীদের বাণিজ্যিক চুক্তি।

৪. কৃষি উৎপাদনের মানের সঙ্গে দামের সামঞ্জস্য যা উভয়ের সম্মতিতেই হবে। ন্যূনতম মূল্যের গ্যারান্টি থাকবে।

৫. চাষের জমির চরিত্র পালটে তা অন্য কাজে ব্যবহারের অধিকার জমির মালিকের থাকবে না।

৬. পণ্য ক্রেতার দায়িত্ব থাকবে পণ্যের ডেলিভারি গ্রহণ করার ও নির্দিষ্ট সময়ে মূল্য মিটিয়ে দেওয়ার। এর দ্বারা চাষিদের ঘুরিয়ে দেওয়ার যে প্রবণতা থাকে তা বন্ধ হবে।

৭. ইন্সিওরেন্স ক্রেডিটের সঙ্গে চাষের এগ্রিমেন্টকে যুক্ত করায় বিভিন্ন কারণে ফসল নষ্ট হওয়ায় চাষি আর্থিক ক্ষতি থেকে বাঁচবে।

৮. ই-রেজিস্ট্রেশন অথরিটির অধীনে কৃষি চুক্তিকে আনা।

৯. চুক্তি বিবাদ মিটানোর জন্য নির্দিষ্ট সময়সীমা এবং কোনো অবস্থাতেই কৃষিজমি অধিগ্রহণ না করার নিয়ম।

১০. এপিএমসি-র অধিনে এক মার্কেটের এমএসই-তে উৎপন্ন দ্রব্য কৃষক অন্য এমএসই-তে বেচতে পারবে। এর ফলে ফড়েরা যে কৃষকদের লোকাল মার্কেটে কম দামে বিক্রি করতে বাধ্য করত তা অবলুপ্ত হলো।

১১. চুক্তি করার সময় উৎপাদিত ফসলের দামের উল্লেখ থাকা আবশ্যিক। যদি মূল্য পরিবর্তনশীল হয় তবে ন্যূনতম মূল্যের উল্লেখ থাকতে হবে।

১২. এমন কোনো চুক্তি সম্পাদন করা যাবে না যেখানে ভাগচাষিদের স্বার্থ ক্ষুণ্ণ হয়।

১৩. চুক্তি ভিত্তিক চাষের ক্ষেত্রে ফসলচাষির ঘর/ক্ষেত থেকে নির্দিষ্ট সময়

ডেলিভারি নিতে বাধ্য থাকবে। এই স্পনসরের দায়িত্ব চাষির, ফসল পৌঁছে দেওয়ার দায়িত্ব নয়।

FARMER's Produce Trade and Commerce (Promotion and Facititation) Bill 2020

১. কৃষক দেশের ও রাজ্যের মধ্যে বিনা বাধায় ও অতিরিক্ত শুল্ক ছাড়া তার সামগ্রী বেচতে পারবে। এতে রাজ্য সরকারগুলির কিছু শুল্ক কমবে এবং শক্তিশালী ফড়ে লবির অনৈতিক ব্যবসা বন্ধ হবে।

২. বাজারে মার্কেট ফি বেআইনি হবে। এই ফি তুলে দেওয়া হলো।

৩/ এপিএমসিগুলি এবং তার অধীনের এমএসপি মান্ডিগুলি থাকবে। তবে কৃষক তাঁর অধিক মূল্যের আশায় এক এপিএমসি এলাকা বা মান্ডি এলাকার থেকে রাজ্যের বা অন্য রাজ্যের এলাকায় উৎপাদিত ফসল বেচতে পারবে।

৪. লাইসেন্স প্রথা বাতিল করা হলো।

৫. চুক্তিতে বিতর্ক দেখা দিলে তা দ্রুত নিরসনের জন্য ত্রিস্তরীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে। প্রথমে বিতর্ক নিরসনবোর্ড তারপর সাবডিভিশনাল ম্যাজিস্ট্রেট স্তরে ও তারপর অ্যাপিল অথরিটি। প্রত্যেক স্তরের নির্দিষ্ট সময় বেঁধে দেওয়া হবে।

Essential Commodities (Amendment) Bill, 2020

১. এই বিল বলছে, কিছু খাদ্যশস্য যেমন— ডাল, চাল, গম, তেল, আলু ইত্যাদি কোনো অতিবিক্ত মূল্য বৃদ্ধি, যুদ্ধ, দুর্ভিক্ষ বা প্রাকৃতিক দুর্যোগ না হলে এবং সরকারি বাধানিষেধ মেনে এর ব্যবসা করার দরকার হবে না।

২. ১৯৫৫ সালে যে খাদ্যশস্য যেমন— চাল, গম, ডাল ইত্যাদিকে অত্যাবশকীয় পণ্যসামগ্রীর মধ্যে গণ্য করা হয়েছিল। তখন খাদ্যশস্যে দেশ স্বয়ংসম্পূর্ণ ছিল না। কিন্তু আজ ৬৫ বছর পরে অবস্থা পালটে গেছে। আজ খাদ্য শস্যে আমরা স্বয়ংসম্পূর্ণ। অত্যাবশ্যকীয় সামগ্রী হিসেবে এগুলির ব্যবসায়ে চাষিদের উপর যে প্রতিবন্ধকতা ও সরকারি বিধিনিষেধ আরোপ করে মধ্যস্বত্বভোগী ও ফড়েদের টাকা লোটার সুবিধা হচ্ছিল তা বন্ধ হলো।

বিরোধী নেতাদের পকেটে হাত পড়ল। কীভাবে? এই নেতাদের পারিবারিক বাণিজ্য হচ্ছে বিভিন্ন ফার্ম বিজেনেস হাউস বানিয়ে, অসংগঠিত ও প্রান্তিক চাষিদের নূন্যতম দাম দিয়ে, কখনো কখনো তাও না দিয়ে ফসল সংগ্রহ করা। আইন করে আগের রাজনীতিকরা এপিএমসি অধীন নির্দিষ্ট মান্ডিতে তাদের বেঁধে দেওয়া নূন্যতম দামে ফসল তুলে দিতে চাষিদের বাধ্য করত। এই বিলের ফলে তা বন্ধ হলো। একটা উদাহরণ দেওয়া যায়। পশ্চিমবঙ্গে আলুচাষি ৩ থেকে ৫ টাকা দরে আলু বেচতে বাধ্য হয়েছে। সেই আলু এখন খোলা বাজারে বিক্রি হচ্ছে ৩৫ টাকা দরে। ক্ষতি চাষির ও ক্রেতার। লাভ রাজনীতিক ঘনিষ্ঠ ফড়েদের। এই ফড়েরাজে আঘাত পরেছে। আগে চাষের জমির চরিত্র পালটে দেওয়া যেত। এখন তা বন্ধ হলো। কোনো কারণে ফসল নষ্ট হলে ইন্সিওরেন্স কোম্পানি ক্ষতি পূরণ করবে। আগে চাষির এই রক্ষাকবচ ছিল না। এখন ওই ফড়েদের কোটারিতে ফসল না বেচে চাষি দেশের বা রাজ্যের যেখানে দাম পাবে সেখানে বেচবে। কৃষিতে ফড়ে রাজত্বের সুবিধার জন্য যে লাইসেন্স রাজ ছিল তা বন্ধ হলো। ফলে মধ্যস্বত্বভোগী কুলাক ও ফড়েরাজের অবসানে চাষি তাঁর ফসলের অধিক মূল্য পাবে আবার উপভোক্তাও কম দামে খাদ্যশস্য কিনতে পারবে। দালাল শ্রেণী না থাকায় ক্ষতি হবে দালালি নেওয়া রাজনীতিবিদদের। তাই তাদের বিরোধিতা ও মানুষকে ভুল বোঝানোর অপচেষ্টা।

বিরোধী রাজনীতিকদের আর্থিক স্বার্থে আঘাত লাগার কারণে তাঁরা উন্মাদের মতো আচরণ করে রাজ্যসভায় ও মাঠে ময়দানে শোরগোল তুলে অসভ্যতা করছেন। তাঁদের ধামাধরারা কিছু মিডিয়া হাউস কাল্পনিক ভয় ও মিথ্যাচার করে এ ব্যাপারে তাঁদের মদত দিচ্ছে। তাঁরা অসত্য যুক্তি সাজিয়ে সাধারণ মানুষকে বিভ্রান্ত করতে চাইছেন। যেমন, তাঁরা বলছেন কৃষিপণ্যের ন্যূনতম সহায়ক মূল্য নতুন কৃষিবিলে থাকছে না। ভুল। কারণ ন্যূনতম সহায়ক মূল্য থাকছে। শুধু কৃষককে অধিকার দেওয়া হয়েছে যে সহায়ক মূল্যের চেয়ে বেশি দামে যদি সে তার ফসল বেচতে পারে তবে সে তার করতে পারবে। নির্দিষ্ট এপিএমসি-র অধীনের নির্দিষ্ট মান্ডিতে আগে কৃষকের ফসল বিক্রি করা বাধ্যতামূলক ছিল। সেটা বন্ধ হওয়ায় কৃষক তাঁর ফসলের এমএসপি অপেক্ষা বেশি মূল্য পাওয়ার সুযোগ নিতে পারবে। আবার লাইসেন্সরাজ বন্ধ হওয়ায় ফড়ে ও দালাল এবং মধ্যস্বত্ত্বভোগীদের অশুভ আঁতাত কৃষককে ঠকিয়ে ফসল গুদামজাত করে বেশি মুনাফা লোটার বাৎসরিক প্রক্রিয়া বন্ধ হবে। এই জায়গায় বিরোধী কিছু রাজনীতিকের আর্থিক ক্ষতির কারণে তাঁরা ক্ষিপ্ত হয়েছেন। তাঁরা বলছেন আর মান্ডি থাকবে না। এটাও ভুল। মান্ডি থাকবে তবে কৃষক আর আগের মতো কোনো নির্দিষ্ট মান্ডিতে ফসল বেচতে বাধ্য থাকবে না। ফল, নিয়ম ও লাইসেন্সের জাতাকলে ফেলে কৃষক শোষণে বাধা হয়ে দাঁড়াল এই বিল। বিরোধীদের বক্তব্য, সরকার নাকি কৃষকের জমি বেচে দিচ্ছে। সর্বৈব অসত্য। বরং উলটোটাই হচ্ছে। এই আইনের পর কৃষিজমির বিক্রি, লিজ, বন্ধক সবই বন্ধ। এমনকী কৃষিজমির চরিত্রও পালটানো যাবে না। বলা হচ্ছে, এই চুক্তি কৃষকের স্বাধীনতা হরণ করবে। ভুল, কারণ কৃষক তার ফসল বিক্রিতে অধিক স্বাধীনতা পাবে। শুধু ফড়ে, দালালদের ও রাজনৈতিক মদতপুষ্ট মধ্য-স্বত্বভোগীদের স্বাধীনতা খর্ব হলো। কারণ, বলা আছে ফসল চুক্তি থেকে বেরিয়ে আসার অধিকার কৃষকের আছে এবং কোনো অবস্থায়ই কৃষকের আর্থিক ক্ষতি করে বা জমির উপর স্বত্ব পাল্টে জমি অধিগ্রহণ, কোনোটিই করা যাবে না। এতদিন ফসল চুক্তির ফলে শুধু কৃষক ও কুলাকশ্রেণীই ক্যাশ ক্রপ যেমন, তুলা, চা, কফি চাষের থেকে লাভবান হতো। এখন থেকে ছোটো ও প্রান্তিক চাষিরাও এইসব ফসল চাষ করে লাভবান হবে।

আরেকটি কথা, এখন থেকে কৃষকরা চাইলে সরাসরি এফসিআই বা অন্য সরকারি গুদামে তাদের ফসল সহজেই বেচতে পারবে। ক্ষতি হচ্ছে বলে ক্ষিপ্ত হচ্ছেন দালালরা। কারণ অত্যন্ত স্পষ্ট। কেন্দ্রীয় সরকার লাইসেন্সরাজ, দালালি ও মধ্যস্বত্বভোগী বন্ধ করতে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। এক কথায়, এতে উপকার হবে উৎপাদনকারী ও উপভোক্তাদের। ■

কৃষি বিল নিয়ে আমাদের রাজ্যের শাসক দলের এত আপত্তি কেন?

বিশ্বপ্রিয় দাস

রাজ্যের শাসক দলের সুপ্রিমো বলেই দিলেন, হিটলারি শাসন চলছে দেশে। তাঁর দলের সাংসদরা একটা বিপ্লবী ভাবমূর্তি তৈরির চেষ্টা করে সংসদে একটা প্রতিবাদী চরিত্র হয়ে বাদল অধিবেশনে বাকি দিনগুলোর জন্য সাসপেন্ড হয়েছেন। আরও কত কী?

আচ্ছা কী এমন হলো যে এই ভূমিকায় নামতে হলো রাজ্যের শাসক দলকে?

আছে আছে, কারণ আছে। কৃষি বিল যে রাজ্যের কৃষিজীবী মানুষের কাছে স্বাধীনতার পরবর্তী সময়ে আশীর্বাদ হয়ে আসছে। একজন কৃষক, তাঁর ফসলের দাম নিজের মতো করে, নিজের পছন্দমতো মানুষের কাছে, নিজেদের নির্ধারিত দামেই বিক্রি করতে পারবেন। সরকারের দেওয়া সমস্ত অনুদান কৃষকের ব্যাঙ্কিং হিসেবে সরাসরি ঢুকবে। ফলে একজন কৃষক, তাঁর অধিকার সম্পর্কে নিজেই বুঝতে পারবেন। এই বিলের উদ্দেশ্যের মধ্যেই আছে, রাজ্যগুলিতে বর্তমানে কৃষিপণ্য বিপণন নিয়ে যে এপিএমসি আইন আছে তা দূর করে আন্তঃরাজ্য কৃষি পণ্যের বাণিজ্য অবাধ করা এবং রাজ্যগুলিতে চুক্তি ভিত্তিক চাষ ব্যবস্থা আইন সিদ্ধ করা। এই আইন বলবৎ হলে কৃষিতে বিনিয়োগ আসবে, কৃষকদের আয় বাড়বে। কেন্দ্রীয় কৃষি উন্নয়ন, কৃষক কল্যাণ ও খাদ্য প্রক্রিয়াকরণ মন্ত্রী নরেন্দ্র সিংহ তোমর বিল পেশ করে বলেছেন, 'কৃষকদের ফসলের ন্যায্য দাম পাওয়ার পথে এই বিল কোনও প্রতিবন্ধকতা তৈরি করবে না।' তিনি আরও বলেন, 'সরকারের তরফে আমি সংসদকে আশ্বাস দিচ্ছি, কৃষিপণ্যের ক্ষেত্রে ন্যূনতম সহায়ক মূল্য ব্যবস্থা এখনও যেমন আছে পরেও তেমনই থাকবে। এ নিয়ে অযথা উদ্বিগ্ন হওয়ার কিছু নেই। জমির মালিকানাও কৃষকেরই থাকবে। কৃষি চুক্তি যা কিছু হবে সেটা উৎপাদিত পণ্যের বিক্রি

নিয়ে, জমি নিয়ে নয়।' নয়া বিল অনুযায়ী, কৃষকরা তাদের মান্ডির বাইরে কাউকে পণ্য বিক্রি করতে হলে এই চুক্তি করবে এবং সে ক্ষেত্রের সংশ্লিষ্ট রাজ্য সরকার ওই কেনাবেচার উপর কোনও কর বসাতে পারবে না।'

করোনা পরবর্তী সময়ে দেশের অর্থনীতিকে কীভাবে চাঙ্গা করে তোলা যায়, সেই চেষ্টায় রয়েছে সরকার। এরই ফলশ্রুতি কৃষি বিলের সংশোধনী। দেশের সিংহভাগ আসে কৃষি থেকে। গোড়া থেকেই এই দিকেই নজর দেবে, এমনটাই হওয়া উচিত। কেননা দেশের কৃষি ক্ষেত্র চাঙ্গা হলে, আর দেশের একেবারে প্রান্তিক প্রান্তের মানুষের হাতে সামান্য অর্থের জোগান বাড়লেই, কিছুটা হলেও দেশের ক্ষেত্রে ওই অর্থটুকুই হাসি ফোঁটাবে প্রান্তিক খেটে খাওয়া মানুষগুলোর মুখে।

করোনা মহামারীতে সারা বিশ্বের অর্থনীতি টালমাটাল অবস্থায়। আমাদের অর্থনীতি তখনই একটু হলেও ঘুরে দাঁড়াবার চেষ্টা করবে, যখন সে তার গ্রামীণ ও কুটির ক্ষেত্রকে নিয়ে এগোবে। এক্ষেত্রে মনে রাখতে হবে যে, আমাদের অর্থনৈতিক পরিকাঠামো অনেকটাই নির্ভর কুটীর শিল্প ও কৃষির অপর। ফলে আমাদের মতো দেশে সবার আগে, যেদিকে লক্ষ্য দেওয়া উচিত, সেটাই করার চেষ্টা করেছে বর্তমান মোদী সরকার। কৃষকদের বা কৃষি শ্রমিকদের যদি আত্মনির্ভর করে, তাঁদের মনের ভিতরকার আস্থাটাকে ফিরিয়ে আনা যায়। তাহলে একটা বড়ো সাফল্য আসতে বাধ্য আমাদের অর্থনৈতিক পুনর্গঠনের বিষয়ে। আমাদের রাজ্যের শাসক দলের এত বিরোধিতা কেন? সে তার দিকে তাকানো যাক। এখানে এখন কায়েম ফড়েরাজ, এই ফড়েরাজ সম্পর্কে সাধারণ মানুষকে আর বলে দিতে হবে না। আমাদের রাজ্যের কৃষক শ্রেণী এই ফড়েদের হাতে বন্দি। যদি বলেন, কীভাবে? তাহলে এক কথায় উত্তর, শাসক শ্রেণীর কৃপাধন্য ও মদতপুষ্ট এইসব মিডল ম্যানরা বাহুবলে নিয়ন্ত্রণ করে পুরো কৃষি পণ্যের বাজার। এদের আবার এলাকা ভাগ করে দেওয়া হয়, শাসক দলের নেতাদের ছত্রছায়ায়। সে কৃষির ও কৃষিজাত পণ্যের সব জায়গাতেই। এরাই ঠিক করে দেন কাকে পণ্য বিক্রি করতে হবে। এবং সেটা অনেক সময় একজন কৃষক যা আশা করে থাকেন, তার থেকে অনেক কমে দিতে হলেও মুখ বুজে বাধ্য হয়ে দিয়ে দিতে হয়। এখানেও চলে কৃষি সিন্ডিকেট। একথা হয়তো ভাববেন বানিয়ে বানিয়ে বলা হচ্ছে, যে কোনো গ্রামে গিয়ে দেখতে পারেন, এই সিন্ডিকেটের অস্তিত্ব। এখানে অবশ্য মুখ্য ভূমিকা পালন করে থাকে শাসক দলের পঞ্চায়েত সদস্য থেকে প্রধান। এদেরকে এড়িয়ে এক দানা উৎপাদিত পণ্য, এদের নির্দিষ্ট করে দেওয়া ফড়ে ছাড়া বিক্রি করা যাবে না। এমনটাই ফতোয়া জারি হয়ে রয়েছে রাজ্যের প্রায় সব গ্রামেই। এই ফসলের কৃষক ও ফড়ের মধ্যে যে লেনদেন হয়, ফড়ের কাছ থেকে কমিশন যেমন নেওয়া হয়, তেমনি নেওয়া হয় কৃষকের থেকেও। এটাকে অন্য ভাবে কাটমানি বললেও ভুল বলা হবে না। আবার আসি, কৃষকদের নামে বেশ কিছু অনুদান পঞ্চায়েত মারফত আসে। এখানেও শাসক দল তৃণমূলের স্বজনপোষণের বিষয়টা ইতিমধ্যেই আমরা সবাই জানি। কেননা নানা পঞ্চায়েতে শাসক দলের অন্দরের কথা বাইরে বেরিয়ে এসেছে আমফান ঘূর্ণিঝড়ের ত্রাণ বিতরণকে কেন্দ্র করে। এই প্রসঙ্গে বলা দরকার, কৃষক বা গ্রামীণ অভাবী মানুষগুলোর নামে অর্থ দেওয়া হয় পঞ্চায়েত মারফত। আর সেখানেই চলে স্বজনপোষণ আর তোলাবাজি- কাটমানির খেলা। এই মাকড়শার জালে আটকে পড়ে শোষিত হন সেই কপর্দকহীন কৃষক বা গ্রামীণ প্রান্তিক মানুষটি। তাঁর ভাঙা বাড়ি ভাঙাই থাকে। সারা বছর খেটে একটু ভালো ভাবে বেঁচে থাকার স্বপ্ন হারিয়ে যায় ফড়ে আর কৃষি সিন্ডিকেটের যাঁতাকলে। এই কৃষি বিল এইসব অনাচার, দুর্নীতি আর শোষণকে ধ্বংস করার হাতিয়ার।

শাসক দলের অনেকেই আওয়াজ তুলেছেন, সবজি মান্ডি নিয়ে। অর্থাৎ সবজির পাইকারি বাজারগুলি নিয়ে। তাঁদের আশঙ্কা এই বিলের কারণে নাকি ওগুলোর আর অস্তিত্ব থাকবে না। জাতির উদ্দেশ্যে দেশের প্রধানমন্ত্রী তাঁর ভাষণে পরিষ্কার ভাষায় বলে দিয়েছেন, এগুলো সব থাকবে। তবে ওই জায়গায় বন্ধ হয়ে যাবে ফড়েরাজ। কৃষক তাঁর উৎপাদিত ফসল বা সামগ্রী যে কোনো মান্ডিতে নিয়ে গিয়ে বিক্রি করতে পারবেন, এই স্বাধীনতার কথা এই বিলে স্পষ্ট করে দেওয়া আছে। আর কৃষকত যেখানে বেশি দাম পাবেন, সেখানেই তাঁর পণ্য বিক্রি করবেন পছন্দমতো ক্রেতার কাছে। ফলে শাসক দলের ওই মান্ডিকেন্দ্রিক সিন্ডিকেটরাজ একেবারেই বন্ধ হয়ে যাবে এই বিলের ঠেলায়।

কৃষক সরাসরি তাঁর ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টে কেন্দ্রীয় সরকারের পাঠানো টাকা পেয়ে যাবেন। এই বিল সেরকম দিক নির্দেশ করেছে। ফলে বন্ধ হয়ে যাবে শাসক দলের স্বজন পোষণ। বঞ্চিত হবেন না প্রান্তিক কৃষক শ্রেণী। অন্যদিকে পঞ্চায়েত থেকে টাকা পেতে গেলে, অলিখিত যে নজরানা ব্যবস্থা চালু আছে, সেটাও বন্ধ হয়ে যাবে। ফলে শাসক দলের কাছে এই কৃষি বিল একটু তেতো লাগবেই।

চুক্তিভিত্তিক জমি চাষের বিষয়টাও এই বিলে আছে। সেক্ষেত্রে গায়ের জোরে, চুক্তি ভিত্তিক কৃষক কেউ উৎখাত করার চেষ্টা হলেও কৃষক সুবিচার চাইতে পারেন। আবার যিনি জমির আসল মালিক, তারও জমি হাতছাড়া হবার ভয় নেই, এই বিষয়েও দিক নির্দেশ আছে। ফলে গায়ের জোরে জমি ছিনিয়ে নেবার গল্প এবার শেষ হবার দিন এসে গেছে। মোদ্দা কথায় কৃষি বিল, একজন কৃষককে আত্মনির্ভর হবার সঙ্গে সঙ্গে এমন এক শক্তি দিল, যাতে সে আর অন্য কোনো শক্তির কাছে মাথা নত করবে না।

কৃষি বিল রাজ্যের শাসক দলের কৃষি সিন্ডিকেটরাজ, ফড়েরাজ, কাটমানিরাজ, স্বজন পোষণরাজ ধ্বংস করে দেবে বলেই এত রাগ কৃষি বিল নিয়ে। এক্ষেত্রের অবব্যবহার করে কৃষকদের দাবিয়ে রাখার যে প্রবাহ চলছে। সেটাও এবার শেষ হবে এই রাজ্যে এই কৃষি বিলের মাধ্যমে। কৃষকরা এই বিলের কারণে এতদিন পর এবার অনেকটাই আত্মনির্ভরতা পাবে, আশা করা যায়। ■

কৃষকের মুক্তির বাধা দালালি শক্তি

কল্যাণ গৌতম

প্রবাদপ্রতিম বাক্য 'সে কহে বিস্তর মিছা/যে কহে বিস্তর।' নতুন কৃষিবিলের বিরুদ্ধে কথা বলতে গিয়ে রাজনীতির ব্যাপারিরা প্রমাণ করে দিয়েছেন, তারা কৃষক-বান্ধব নন, দালাল-মিত্র। কারণ, 'কান্না' দ্বিবিধ— সত্য ক্রন্দন ও মায়াকান্না এবং মনুষ্য-অশ্রু ও কুম্ভীরাশ্রু। বিলে বা আইনে যা নেই, তা পরিবেশন করে মানুষের কাছে অসত্য ও অর্ধসত্য পরিবেশন করা অন্যায়।

কৃষি বিষয়ক কী কী আইন পাশ হয়েছে :

১. কৃষি পণ্য ব্যবসা-বাণিজ্য (উৎসাহ ও প্রতিশ্রুতি) আইন [The Farmers' produce trade and commerce (Promotion and Facilitation) Act, 2020]

২. কৃষক (ক্ষমতায়ন ও রক্ষা) মূল্য নিশ্চতকরণ এবং কৃষি পরিষেবা আইন [The Farmers (Empowerment and Protection) Agreement on price assurance and farm services Act, 2020]

৩. অত্যাবশ্যকীয় পণ্য আইন [The Essential Commodities (Amendment) Act, 2020]

আইন চালুর পশ্চাতে উল্লেখযোগ্য দিনপঞ্জি :

৫ জুন : অধ্যাদেশ জারি।

১৪ সেপ্টেম্বর : বিল আকারে লোকসভায় উপস্থাপন। উপস্থাপক নরেন্দ্র সিংহ তোমর, কেন্দ্রীয় কৃষি, কৃষক কল্যাণ, গ্রামোন্নয়ন ও পঞ্চায়েত মন্ত্রী।

১৭ সেপ্টেম্বর : লোকসভায় বিলটি পাশ।

২০ সেপ্টেম্বর : রাজ্যসভায় বিলটি পাশ।

২৪ ও ২৬ সেপ্টেম্বর : রাষ্ট্রপতির অনুমোদন।

২৭ সেপ্টেম্বর : আইন ও বিচার মন্ত্রকের দ্বারা সরকারি গেজেট প্রকাশ, ৫ জুন থেকে লাগু।

কৃষিপণ্য ব্যবসা-বাণিজ্য আইনে যা লেখা হয়েছে : An act to provid for the creation of an eco-system where the farmers and traders enjoy the freedom of choice relating to sale and purchase of farmers' produce which facilitates remunerative prices through competitive alternative trading channels; to promote efficient, transparent and barrier-free inter-State and intra-State trade and commerce of farmers' produce outside the physical premises of marketa or deemed markets notified under varoius State agricultural produce market legislations, to provice facilitative framework for electronic trading and for matters connected therewith or incidental thereto.

কৃষি সুরক্ষা আইনে বলা হয়েছে— An Act to provide for a national framework on farming agreement that protects nan empowers farmers to engage with agribusiness firms, procssors, wholesalers, exporters or large retailers for farm services and sale of future farming produce at a maturity agreed remunerative price framework in a fair and transperent manner and for matters connected therewith or incidental thereto.

অত্যাবশ্যকীয় পণ্য (সংশোধনী) আইনে জোড়া হয়েছে নিম্নলিখিত অংশগুলি : (a) The Supply of such foodstuffs including cereals, pulses, potato, onions, edible oilseeds and oils, as the Central Govt. may be regulated only under extraordinary circumstances which may includ war, famine, extra ordinary price rise and natural calamities of grave nature. (b) any action on imposing stock limit shall be based on price rise and an order for regulating stock limit of any agricultural produce may be issued under this Act only if there is (i) hundred per cent increase in the retail price of horticultural produce, (ii) fifty per cent increase in the retail price of non-perishable agricultural; foodstuffs over the price prevailing immediately preceeding twelve months; or average retail price of last five years whicever is lower provided that such order for regulating stock limit shall not apply to a processor or value chain participant of any agricultural produce, if the stock limit of such person does not exceed the overall ceiling of installed capacity of processing, or the demand for export in case of an exporter.

রাজনৈতিক তরজার পর কৃষিমন্ত্রীর প্রতিক্রিয়া :

বিল পাশের পর থেকেই দেশব্যাপী বিরোধীরা অপপ্রচার শুরু করে দিয়েছে। বিরোধী পক্ষ থেকে প্রচার করা হয়েছে সহায়ক মূল্য নির্ধারণের দায়িত্ব সরকার আর বহন করবে না। পুঁজিপতি ও বহুজাতিক সংস্থাগুলি কৃষিপণ্যের দরদাম নিয়ন্ত্রণের অধিকার ভোগ করবে, তারা কৃষককে কুক্ষিগত করে রাখবে, সরকার রক্ষাকবচ দিতে পারবে না। এ প্রেক্ষিতে কৃষিমন্ত্রী স্পষ্ট ঘোষণা করেছেন, ন্যূনতম সহায়ক মূল্য ফসল সংগ্রহের কাজ যেমন চলছে, সেই ভাবেই চলবে। প্রধানমন্ত্রীও ভারতবাসীকে আশ্বস্ত করেছেন।

২৪ সেপ্টেম্বর কৃষিমন্ত্রী নরেন্দ্র সিংহ তোমর বিলের বিরুদ্ধে বিরোধী দলগুলির অপপ্রচারের প্রেক্ষিতে দুটি টুইটার করেন—

1. Firstly, Bill will give price guar-

antee to farmers at time of sowing. Second, selling ageements will only deal with the produce and there can be no mention of farmland Farmers can opt out of agreement, traders cannot. Farmers and their land are fully protected. অর্থাৎ প্রথমত এই বিল চাষিকে বীজ বোনার সময়েই ফসলের দামের গ্যারান্টি দেবে। দ্বিতীয়ত, বিক্রয় চুক্তি কেবলমাত্র উৎপাদনের উপর, তার সঙ্গে কৃষিজমির ব্যাপারে কোনো উল্লেখ নেই। কৃষক চুক্তি থেকে সরে আসতে পারে, ব্যবসায়ী পারবে না। কৃষক ও তার কৃষিজমি পুরোপুরি সুরক্ষিত।

2. Has MSP ever been part of law? Congress ruled for 50 years, why didn't they incorporate it in law" They're making issue as they don't have anything to criticise. MSP has always been Govt. of India's administrative decision and remains so. অর্থাৎ কোনোদিনই কি ফসলের ন্যূনতম সহায়ক মূল্য আইনের অঙ্গ ছিল? কংগ্রেস তো ৫০ বছর শাসন করেছে। তারা কেন এতদিন তা আইনের অঙ্গীভূত করল না? তারা এটাকে একটি রাজনৈতিক ইস্যু করেছে, যেহেতু এই বিলের বিরুদ্ধে সমালোচনার আর কোনো জায়গা নেই। ন্যূনতম সহায়ক মূল্য সবসময় ভারত সরকারের একটি প্রশাসনিক সিদ্ধান্তই ছিল এবং থাকবে।

বিরোধীরা যা বলছে তা কি সত্য?

বামপন্থী, তৃণমূলি ও কংগ্রেসি ঘরানারা সংবাদপত্রগুলির দাবি এই আইনে আত্মনির্ভর নয়, আত্মসমর্পণে বাধ্য হবে কৃষকেরা। এই বিল ও আইনপ্রণয়ন এক তুঘলকি কাণ্ড, স্বৈরতান্ত্রিক সিদ্ধান্ত; এতে নাভিশ্বাস উঠবে কৃষকের।

মূল সত্য হলো, এই আইন কিন্তু বিচ্ছিন্ন চিন্তাভাবনা থেকে করা হয়নি। করা হয়েছে আত্মনির্ভরশীল ভারত নির্মাণের প্রয়াসের হিসেবে, পরিপূরক ও সাযুজ্যপূর্ণ সরকারি প্রচেষ্টারূপে। যেমন নতুন শিক্ষানীতিতে সামগ্রিক কৃষিশিক্ষার বিশেষ বন্দোবস্ত রাখা হয়েছে, ক্লাস সিক্স থেকে পেশাভিত্তিক ও কারিগরি শিক্ষার সূত্রপাতে কৃষি ও অন্যান্য ক্ষুদ্রশিল্পকে প্রধান্য দেওয়া; বিদেশি নির্ভরতা কমিয়ে দেশীয় অর্থনীতির সমৃদ্ধিকরণ, তার গুরুত্বপূর্ণ অঙ্গ হিসেবে কৃষি-গ্রামীণ শিল্পকে উৎসাহ দান, ভারতবর্ষকে 'Food busket of the World' হিসেবে তুলে ধরে আন্তর্জাতিক স্তরে সমৃদ্ধ ও সশক্ত-ভারতের আত্মপ্রকাশের দীপ্তি, ২০২০ সালের মধ্যে কৃষকের দ্বিগুণ লাভ পাইয়ে দিয়ে কৃষিকাজে আকৃষ্ট করা— এ সমস্তই হচ্ছে এক অভিন্ন চিন্তনের ফলশ্রুতি। একে যারা তুঘলকি বলছেন, তারা আসলে কেবলমাত্র তুঘলকের ইতিহাসটুকুই পড়েছেন, পড়াটাও অস্বাভাবিক নয়, কারণ ইতিহাস অমন করেই লেখা হতো, ভারতবর্ষে তুঘলকি ইতিহাসবেত্তাদের জমপেশ আড্ডা ছিল।

যাঁরা কৃষি বিলের রাজনৈতিক বিরোধী, তাঁরা কোন জায়গা থেকে বিরোধিতা করছেন? তাঁর কি বলতে চান, এই আইন আসার আগে দীর্ঘ ৭০ বছর যাবৎ কৃষকের অবস্থা ভালো ছিল? আইন আসার পর সব খারাপ হয়ে যাবে? মানে, সব কৃষক এখন ঠিকঠাক বাজারদর পাচ্ছেন, লাভ নিয়ে ঘরে যাচ্ছেন? এখন আইন রূপায়ণ হলেই সব বন্ধ হয়ে যাবে? তার মানে কৃষকদের জন্য ৭০ বছর যাবৎ বলবৎ রাখা ব্যবস্থাটাই ভালো, তাই তো? মানে অসংখ্য দেশি ফড়ে, দালাল, রাজনীতির রক্তচক্ষু দেখানো নেতার নিয়ন্ত্রণে থাকা বাজার মান্ডিতে চাষিরা খুব ভালো দাম পাচ্ছেন! বোঝাতে চাইছেন, এখন কৃষক নিজের ইচ্ছেমতো চাষ করে, তা বিক্রি করতে পারছেন। বিক্রির কোনো চিন্তা নেই, ফসল বাড়ি এসে লাভজনক দাম দিয়ে কিনে নিয়ে যাচ্ছেন ফড়েরা? চাষে লাভ হওয়ায় সব চাষিই চাষে নিয়োজিত। গ্রামে চাষ ছেড়ে কেউ শহরে আসেনি? গ্রাম-উদ্ভূত পরিযায়ী শ্রমিক— এসব মিথ্যে কথা? তারা কী ভাবছেন, যারা সংগঠিত নয়, যাদের উপর সহজেই প্রভুত্ব বিস্তার করা যায়। বোবা হাবা কৃষকের জন্য না ভেবে চালাকচতুর, রাজনীতি-নিবিড় কমিশন এজেন্টদের জন্য ভাবলেই হবে? দালালরা হল্লা করতে পারে, সুবিধা পেলেই রাজনীতির ঝোলার মধ্যে আশ্রয় নিতে পারে, ধমকাতে চমকাতে পারে। আর পারে বলেই তাদের সামাজিক প্রতিপত্তি আছে। সেজন্যই কৃষককে বাদ দিয়ে দালালদের দেখতে হবে? বহু রাজনীতির নেতা কমিশন এজেন্ট হয়ে আড়তদারি-গদিতে বসে আছেন। তাই তাদের হয়ে চিল-চীৎকার কগরে বিলের শুভঙ্করী দিকগুলি আড়াল করা হচ্ছে।

সুপারফাস্ট ট্রেন চালু হবার পর যখন অনেক স্টেশনে না দাঁড়িয়ে যাত্রীস্বার্থে দ্রুত গন্তব্যে পৌঁছে দেয়, তখন কিছু স্টেশনের স্টলে বিক্রিবাটা কম হয়, সেই স্টেশন চত্বরের বাইরে থাকা হোটেল- রেস্টুরেন্ট, পানশালায় যাত্রী সংখ্যাও কমে যায়। ধরা যাক এই ক্ষোভ প্রশমনের জন্য সব স্টেশনে দাঁড়ানো হতে থাকলো, তাতে যাত্রীস্বার্থ বিঘ্নিত হবে। কারণ বহু জরুরি কাজে দূরপাল্লায় যাত্রীরা যান, কেউ চিকিৎসার জন্য, কেউ চাকরির পরীক্ষা দিতে, কেউ জরুরি পরিষেবা দিতে। তেমনই 'ক' স্থান থেকে 'খ' স্থানে পৌঁছাতে উড়ালসেতু যখন নির্মিত হয়, কোনো রাস্তা মেরামতের প্রয়োজনে কোনো বিশেষ দিকে গাড়িঘোড়া ঘুরিয়ে দেওয়া যায়— সবটাই যাত্রীস্বার্থের কথা ভেবে, সেই রাস্তায় গড়ে ওঠা পানশালা, রেস্টুরেন্টে বিক্রিবাটার আবদার বজায় রাখার জন্য তো নয়। তেমনই এই কৃষি বিষয়ক আইন কৃষক ও ভোক্তার প্রয়োজনের কথা ভেবে করা হয়েছে— কৃষক দাম পাবেন বেশি, দালালহীন বাজারে ভোক্তার মূল্য চোকাতে হবে কম। দালাল শ্রেণীর স্বার্থ দেখার জন্য এই আইন তৈরি হয়নি। কৃষকের স্বেদ-শোণিত উজাড় করা ফসলে, শ্রমকিণাঙ্ক কঠিন হাতের সামনে ত্রস্তা-ধরণীর নজরান-রূপ ফসলে বাটপাড়ি করার সুযোগ জিইয়ে রাখার জন্য এই আইন করা হয়নি। যাদের স্বার্থে ঘা লেগেছে, তারাই হাঁপাচ্ছে, তারাই উত্তাল, রাজ্যসভায় বিলের প্রতিলিপি, রুল বুক ছিঁড়ছে— এটা ছিন্নতার রাজনীতি, এটা দালালির রাজনীতি, এটি যেদিন কৃষক বুঝতে সক্ষম হবে তখনই আসবে আত্মনির্ভর কৃষি।

অনেকে চোখে আঙুল দিয়ে দেখাচ্ছেন, অকালি নেত্রী কেন্দ্রীয় মন্ত্রী হরসিমরত কউর বাদলের প্রতিবাদ ও পদত্যাগ, যেন সরকারের ঘরেই আগুন লেগে গেছে! কে এই হরসিমরত? তিনি হচ্ছেন পঞ্জাবে বিজেপির শরিক আকালি দলের প্রধান সুখবীর সিংহ বাদলের পত্নী। অনেকেই জানেন, সুখবীর পঞ্জাবের একজন হেভিওয়েট মজুতদার, জানেন তাদের কৃষিব্যবসার বিপুল আয়ের পরিমাণ, কৃষকদের মধ্যে কমিশন এজেন্ট হিসেবে তার কমিশন শতাংশ। তথ্যভিজ্ঞ মহল অনুমান করতে পারবেন, এক ঝটকায় ওই নেতাদের কত হাজার কোটি টাকা কমিশন বাবদ লাভ করা থেকে ক্ষতি হলো। মহারাষ্ট্রেও একই অবস্থা। শরদ পাওয়ার কন্যা সুপ্রিয়া সুলের কৃষি থেকে কত হাজার কোটি টাকা বা লক্ষ টাকার আয়। বিশেষজ্ঞ মহল জানেন রাজনীতিতে কোন কোন পরিবার পেঁয়াজ, লঙ্কা, আঙুরের ব্যবসায়ে নিয়ন্ত্রণ পুষে রেখেছে। তাই এই আইন সরকার রচনা করেছে দালাল বৃক্ষের ডাল কাটতে নয়, সরাসরি শিকড় উৎপাটন করতে। শরিক দল, আপন দল, বিরোধী দল বাছবিচার না করে এই আইন সরকারের এক নির্মোহ-চিন্তন, তাতে কোনো সুখী নেতা ভিক্ষাপাত্র নিয়ে বেরোবেন কিনা, সেটা চিন্তা করলে কৃষকদের প্রতি অবিচার হবে।

বিরোধীরা কেন হইচই করছে:

বিরোধী দলের পাণ্ডারা হই-হট্টগোল কেন করছে, কারণ কৃষকদের মধ্যে একটা আতঙ্ক

ছড়াতে চাইছে তারা। এবং নিজেদের রাজনৈতিক লাভ জোটানোর চেষ্টা চালাচ্ছে। নিজের জমি নিয়ে কৃষকরা সবসময় একটা আতঙ্কে আছে, একটা দীর্ঘ লোকস্মৃতির ফলশ্রুতি এই আতঙ্ক। হাজার বছর ধরে বিদেশি আক্রমণকারী, বিদেশি শাসক, তাদের বশংবদ জমিদার, ধর্মীয় মৌলবাদীদের যোগসাজশে নিজের বাপ-ঠাকুরদার জমি হারিয়েছে অনেক ভারতবাসী। কাজেই জমি বন্ধকের কথা গেলালে, জমি হারানোর মিথ্যে ভয় দেখালে কৃষককে এককাট্টা করা যাবে, লোকও জমতে পারে বিস্তর। তাই প্রথমে ভয় ধরানো কথা বলতে হবে— এই বিলে জমি চলে যাবে কৃষকের। যেন 'চিলে কান নিয়ে উড়ে গেছে'। জমি ফেরত পাওয়ার সম্ভাবনা নেই। বাস্তব সত্য হলো, এই বিলে জমি নেওয়ার কোনো কথা নেই। আছে মধ্যস্বত্বভোগীর অন্যায় ভিড় খালি করে দেওয়ার কথা, কৃষককে ন্যায্যমূল্য দেবার বন্দোবস্ত, তাদের ক্রয় ক্ষমতা বাড়ানোর চেষ্টা। চেষ্টা হচ্ছে কৃষিপণ্যরূপ লক্ষ্মী যেন মাটিতে গড়াগড়ি না খায়। ফসল অযত্নে পচে নষ্ট হওয়া মানে সারা দেশের ক্ষতি। সারাবিশ্বের বহু দেশে বহু অযোগ্য শাসনে মানুষের মুখে অন্নের জোগান নেই। আর একটি দেশে ফড়েদের উৎপাতে আলু-টমেটো খেঁতলে গড়াগড়ি খাবে, দাম পাবে না— এ হতেই পারে না। অধিক উৎপাদন প্রক্রিয়াকরণের ব্যবস্থা হবে, সংরক্ষণের আরও বিপুল আয়োজন হবে, তবে একটা দেশ লক্ষ্মীমন্ত দেশ হয়ে উঠতে পারে। খনিজতেল উৎপাদনকারী দেশগুলি সমবেতভাবে বিশ্ব অর্থনীতিকে নিয়ন্ত্রণ করে, ইউরোপীয় ইউনিয়ন সারাবিশ্বকে নিয়ন্ত্রণ করে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিতে, তবে কেন ভারত-সহ দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া ফসল-ভাণ্ডার নিয়ে সারাবিশ্বকে নিয়ন্ত্রণ করবে না? ভারতের এই নবতর রাজবেশ ধারণের বিরোধীরাই আসলে আত্মনির্ভর ভারতের বিরোধী, কৃষির সর্বোচ্চ গরিমায় পৌঁছানোর বিরোধী। এই বিরোধী শক্তি ভারতকে লক্ষ্যে পৌঁছাতে না দেবার পণ করেছে, দেশবাসী তা যত তাড়াতাড়ি বোঝে ততই মঙ্গল।

কেমনে বেটা পেরেছে সেটা জানেতে :

এই আইন পাশে কংগ্রেসের সমর্থন দেওয়ার কথা, সেখানে তারা বিরোধিতা কেন করছে? জানা যাচ্ছে, ২০১৯ সালে কংগ্রেসের নির্বাচনী ইস্তেহারে এপিএমসি অর্থাৎ এগ্রিকালচারাল প্রোডিউস মার্কেটিং করপোরেশন আইন পরিবর্তনের প্রতিশ্রুতি ছিল। তাতে বিভিন্ন রাজ্যের মধ্যে পণ্য বিক্রি সংক্রান্ত বাধা দূর করার কথা ছিল, আন্তর্জাতিক রপ্তানি বাজারের বাধা দূর করার কথা ছিল। প্রতিশ্রুতি ছিল অত্যাবশ্যকীয় পণ্যের আইন তুলে দেবার, ছিল সরকারি নিয়ন্ত্রণ ছাড়াই মর্জিমাফিক পণ্য বিক্রির কথা। তাহলে তারা বিরোধিতা করছে কেন? বিরোধিতা করছে, কারণ বিরোধী আসনে বসে যা জ্ঞান দেওয়া যায়, ক্ষমতায় বসে তা রূপায়ণ করার দম থাকে না অনেক রাজনৈতিক দলের। কংগ্রেসের হয়েছে সেই দশা! রবীন্দ্রনাথের 'জুতো আবিষ্কার'- এর মতো 'কেমনে বেটা পেরেছে সেটা জানতে!'

তৃণমূল কংগ্রেসেরও এই আইনের বিরোধিতা করা নৈতিকভাবে অনুচিত। ২০১৪ সালে রাজ্য সরকার চালু করেছিল এমন আইন যার ফলে আজ বিভিন্ন বহুজাতিক সংস্থা যেমন মেট্রো ক্যাশ অ্যান্ড ক্যারি, রিলায়েন্স ফ্রেশ, পেপসি তাদের প্রয়োজনের নানান ফসল চাষ করিয়ে নিতে পারছে।

তৃণমূল কংগ্রেসেরও এই আইনের বিরোধিতা করা নৈতিকভাবে অনুচিত। ২০১৪ সালে রাজ্য সরকার চালু করেছিল এমন আইন যার ফলে আজ বিভিন্ন বহুজাতিক সংস্থা যেমন মেট্রো ক্যাশ অ্যান্ড ক্যারি, রিলায়েন্স ফ্রেশ, পেপসি তাদের প্রয়োজনের নানান ফসল চাষ করিয়ে নিতে পারছে।

অনেক রাজ্যে কৃষি বিপণন আইন পরিবর্তন করে এমন করা হয়েছে, যার ফলে চাষিদের পণ্য বিক্রি করতে বাধ্য হতে হয় নির্দিষ্ট মান্ডিতে, আর মান্ডি চালায় সেই রাজ্যের শাসকদলের ছোটো বড়ো নানান মাপের নেতা। তারা সেখানে কমিশন এজেন্ট হিসেবে প্রতিভাত।

কৃষিবিল বিষয়ে ভারতীয় কিষান সঙ্ঘের অবস্থান :

২২ সেপ্টেম্বর ভারতীয় কিষান সঙ্ঘের পক্ষ থেকে অখিল ভারতীয় মহামন্ত্রী বদ্রী নারায়ণ চৌধুরীর স্বাক্ষর সংবলিত একটি বিশেষ পত্র সর্বসাধারণের জ্ঞাতার্থে প্রচারিত হয়েছে, তাতে কিষান সঙ্ঘের অভিমত ব্যক্ত রয়েছে।

শ্রী চৌধুরী লিখেছেন, ৫ জুন কেন্দ্রীয় সরকার দ্বারা তিনটি অধ্যাদেশ আনা হয়েছিল, যেখানে ভারতীয় কৃষক দেশ জুড়ে যে কোনো কৃষিজ পণ্য বিক্রি করতে পারবেন। এটিই বিল রূপে লোকসভা ও রাজ্যসভায় পেশ ও অনুমোদিত হয় এবং তা রাষ্ট্রপতির কাছে স্বাক্ষর করার জন্য প্রেরিত হয়। পরে ২৭ সেপ্টেম্বর ভারত সরকার তা আইন রূপে গেজেট আকারে প্রকাশ করে।

বিল সম্পর্কে ২২ সেপ্টেম্বর ভারতীয় কিষান সঙ্ঘের পর্যবেক্ষণ ছিল, এই বিল কৃষককে পণ্য বিক্রির সুযোগ বাড়াতে সহায়তা দেবে। মান্ডি বা কৃষি-বাজারে যেভাবে কৃষকেরা আর্থিকভাবে শোষিত হয়, মানসিকভাবে প্রতারিত হয়, তা থেকে মুক্তির সম্ভাবনা তৈরি করবে এই বিল। কিন্তু পাশাপাশি আশঙ্কা প্রকাশ করেছে ভারতীয় কিষান সঙ্ঘ। কৃষিপণ্য বেচাকেনায় লাভকারী মূল্য যে মিলবে, কৃষকের সঙ্গে যে ধোঁকাবাজি করা হবে না, সে বিষয়ে কোনো গ্যারান্টি এই কানুনের মধ্যে পাওয়া যাচ্ছে না। এখানে সমর্থন মূল্যের কথা (Minimus Supporting Price) নেই। এই প্রেক্ষিতে কিষান সঙ্ঘের দাবি, যদি কৃষককে দাম দিয়ে চাষে লাভ পাইয়ে দিতে হয়, তাতে কমপক্ষে ফসলের সমর্থন মূল্যে বেচাকেনার কানুন আনা উচিত। একটি আলাদা কানুন তৈরি করে দেশের যে কোনো ফসল সমর্থন মূল্যের কমদামে বিক্রি হবে না, সেই পথ সুনিশ্চিত করার আইন আনতে হবে।

কিষান সঙ্ঘের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, সরকারের ঘোষিত উদ্যোগ যদি সফল করতে হয়, তাহলে এই পরিবর্তনগুলি করতে হবে।

১. কৃষিজ যাবতীয় পণ্য যে কোনো স্থানে ক্রয়ের ক্ষেত্রে ন্যূনতম সমর্থন মূল্যের কম দেওয়া যাবে না। এজন্য আলাদা করে আইন তৈরি করতে হবে।

২. কৃষি ব্যবসায়ীদের নিবন্ধীকরণ কেন্দ্রগুলি ব্যাঙ্কের সিকিউরিটির সঙ্গে যুক্ত হতে হবে এবং সেই সংক্রান্ত জ্ঞাতব্য তথ্য সরকারি পোর্টালের মাধ্যমে উপলব্ধ হতে হবে।

৩.এই সংক্রান্ত যাবতীয় বিবাদ নিরসনের জন্য স্বতন্ত্র কৃষি ন্যায়াধিকরণ স্থাপন করতে হবে। এবং এই বিবাদ প্রত্যেক জেলার কৃষকদের জন্য আলাদাভাবে নিরসন করতে হবে।

৪. অত্যাবশ্যকীয় পণ্য বা জীবনাবশ্যক বস্তুর অধিনিয়ম সংশোধন করার সময় ভাণ্ডার সীমার উপরের সমস্ত বাধা সরিয়ে দিতে হবে। শুধু বিশেষ পরিস্থিতিতেই এই নিয়ম চালু হবে। ▮

বিশেষ রচনা

ভণ্ড সেকুলারদের কবল থেকে মুক্ত হয়ে দেশ শক্তিশালী হয়ে উঠছে

ড. মনমোহন বৈদ্য

অযোধ্যায় শ্রীরাম মন্দিরের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন অনুষ্ঠানের গৌরবময় মুহূর্তের সাক্ষী হয়ে থাকলেন সমস্ত ভারতবাসী এবং বিশ্বজুড়ে বসবাসকারী প্রবাসী ভারতীয়রা। একদিকে যখন বহু শতাব্দীকাল ধরে চলে আসা সংগ্রাম ও সমস্ত বাধা বিপত্তি অতিক্রম করে কোটি কোটি ভারতবাসীর স্বপ্ন পূরণ হতে চলেছে, অন্যদিকে তখন রাজনীতিবিদরা বিশেষত দেশের তথাকথিত সেকুলারপন্থীরা যারা সেকুলারিজমের নামে সাম্প্রদায়িক রাজনীতি করে থাকেন এবং দেশের অখণ্ডতা ভঙ্গের কারবার চালিয়ে যাওয়ার মানসিকতা বিশিষ্ট দেশবিরোধী কার্যকলাপে লিপ্ত বুদ্ধিজীবী ও সাংবাদিকদের এই ঘটনায় অদ্ভুতভাবে চিন্তিত হতে দেখা গেল। কিছু সেকুলারবাদী রাজনীতিবিদ যারা ইতিমধ্যেই ক্রমবর্ধমান জাতীয়তাবোধ বৃদ্ধি সম্বন্ধে অবগত হয়েছেন এবং রামমন্দির সম্বন্ধে তাদের নীতি পরিবর্তনও করেছেন। কারণ তাদের ভয় আগামী নির্বাচনের ফলাফল নিয়ে। তথাকথিত কিছু বুদ্ধিজীবী ও সাংবাদিক যারা ভারত বিভাজনের উস্কানি ও অরাজকতা সৃষ্টি করে জীবিকা নির্বাহ করে থাকেন এখন কাঁদুনি গাইছেন এই বলে 'যে ভারতীয় সংবিধান বিপদগ্রস্ত, কারণ সেকুলারিজম বিপদগ্রস্ত হয়ে উঠেছে'। এই কাঁদুনির মাধ্যমে তারা ভারতীয় জনগণকে বিভ্রান্ত করে বিশ্বাস জাগাতে চাইছেন যে ভারতবাসী যে সেকুলারিজম দেশে দেখে আসছেন তা ভারতীয় সংবিধানের একান্তই নিজস্ব এবং শুরু থেকেই এই সংবিধানের এক অভিন্ন অংশ হয়ে রয়েছে। ব্যাপারটা অনেকটা বোঝানো হচ্ছে ঠুলিপরা লাগাম লাগানো টাঙ্গাগাড়ির ঘোড়ার মতো, যেন সে মুখে লাগাম নিয়েই জন্মেছে।

সংবিধানের অভিভাবক জাহিরকারীরা চিৎকার জুড়ে দিয়েছে যে, সংবিধানের সঙ্গে প্রতারণা করা হচ্ছে। অথচ অবৈধভাবে সংযোজিত এই 'সেকুলার' শব্দটিই সংবিধানের সঙ্গে প্রকৃত প্রতারণার এক নির্দশন। আমাদের সংবিধান প্রণেতারা সেকুলারিজম সম্বন্ধে মোটেই অজ্ঞাত ছিলেন না। শ্রী কে টি শাহের পরামর্শ ছিল যে, ভারতকে এক 'সেকুলার সোশ্যালিস্ট রিপাবলিক' হিসেবে ব্যাখ্যা করে প্রতিষ্ঠা করা হোক। এক গম্ভীর বিতর্কের পর সংবিধান সভার সদস্যরা বিবেচনা করেন যে, ভারতীয় পরিস্থিতিতে এই প্রস্তাব অপ্রয়োজনীয় এবং সেজন্যই একে অগ্রাহ্যও করা হয়েছে। মধ্যযুগের ইউরোপের সামাজিক, রাজনৈতিক পরিস্থিতির সাপেক্ষে সেকুলারিজম ধারণার আবির্ভাব। পাশ্চাত্যের হাজার বছরের ঐতিহাসিক পটভূমিতে পোপ নিয়ন্ত্রিত যাজক সম্প্রদায়-শাসিত দেশের প্রতিক্রিয়ায় চার্চের নাগপাশ থেকে সমস্ত ধর্মবর্হির্ভূত বিষয়বস্তুকে পৃথক ও নিয়ন্ত্রণমুক্ত করতে চালু হয়েছিল সেকুলারিজম নীতি। কিন্তু ভারতবর্ষের সুদীর্ঘ ইতিহাসে এই ধরনের প্রয়োজন আদৌও অনুভূত হয়নি। আমাদের কোনোকালে কোনো প্রকার ধর্মরাষ্ট্রের ধারণা ছিল না। আমাদের অধ্যাত্ম ভিত্তিক একাত্মবোধ ও সামগ্রিক জীবনাদর্শের ধারণায় সংবিধান প্রণেতারা ভবিষ্যতে সেকুলারিজমের সম্ভাবনাও দেখতে পাননি। আমাদের কখনও কোনো ধর্মরাষ্ট্র ছিল না। সুপ্রাচীন ভারতীয় সভ্যতা হিন্দু জীবনশৈলীর সামগ্রিক ও একাত্মতার আদর্শে প্রতিষ্ঠিত ও পরীক্ষিত। এটাই আমাদের সংবিধান প্রণেতাদের বিচার্য ছিল এবং ভবিষ্যতেও থাকবে এই বিশ্বাসও ছিল।

সেকুলারিজমকে স্বীকৃতি দিতে ধর্মবিরোধী, অধার্মিক বা নাস্তিক হওয়ার প্রয়োজন হয়নি। বাস্তবে একজন ব্যক্তির সেকুলার হওয়া অসম্ভব, যদি কেউ এমন দাবিও করে থাকে তবে সে হয় মিথ্যা বলছে অথবা প্রতারণা করছে।

১৯৭৬ সালে 'জরুরি অবস্থা'র সময় সংবিধানে 'সেকুলারিজম' শব্দটি সংযোজিত করে দেশবাসীর উপর চাপানো হয়েছে বিরোধীশূন্য লোকসভায় গণতান্ত্রিক নিয়মনীতির সঙ্গে আপোশ করে। কারণ বিরোধীদের বলপূর্বক গ্রেপ্তার করা হয়েছিল এবং গ্রেপ্তার এড়াতে কেউ কেউ আত্মগোপন করেছিলেন। ভারতীয় বিচারব্যবস্থা সুসংহত। আমাদের অধিকার আছে নিম্ন আদালতের রায়কে আপত্তি জানিয়ে উচ্চ আদালতে যাওয়ার। উচ্চ আদালতের বিচার অপছন্দ হলে সর্বোচ্চ আদালতে যাওয়া যায়, এমনকী সেখানেও রায় কোনো সমাধান দিতে ব্যর্থ বা অপছন্দের

হয় সেক্ষেত্রেও উপায় আছে বিষয়টিকে জজদের বৃহৎ বেঞ্চে বিচার চাওয়ার। যখন সমস্যার সমাধানে প্রয়োজনে সংবিধান সংশোধনের উপায় আছে পার্লামেন্টে বিতর্কের ও সংখ্যাগরিষ্ঠের মতামতের তা সুপ্রতিষ্ঠিত করার। সেক্ষেত্রে ইতিপূর্বে কনস্টিটিউয়েন্ট অ্যাসেমব্লিতে একাধিকবার উপস্থিত 'সেকুলার' শব্দের সংযোজন কোনো আইনগত পদ্ধতি ব্যতিরিকেই করা হয়েছে। জরুরি অবস্থাকালীন আতঙ্কের মধ্যেই, কোনো প্রকার দাবি অথবা বিতর্ককে পাশ কাটিয়ে এই সংযোজন স্পষ্টতই সংবিধানে উপস্থাপিত করা— এটাই ভারতীয় সংবিধানের সঙ্গে এক প্রকৃত ছলনা। কয়েক দশক ধরে চাপিয়ে দেওয়া এই 'সেকুলারিজম' আমাদের জাতীয় ও সমাজজীবনে ব্যাপক প্রভাব বিস্তার করেছে কিন্তু আজ অবধি এর চূড়ান্ত অর্থ বিবেচনার বিষয় রয়ে গেছে। এমনকী সংবিধানে এর যথার্থ সংজ্ঞাও করে উঠতে পারেনি। এই শব্দার্থ রহস্যের অন্তরালে, সুপরিকল্পিত ভাবে ষড়যন্ত্র করে বিদেশি ধারণা যুক্ত করার এই প্রচেষ্টা ভারতীয় সামগ্রিক বিবেকে ভ্রান্তি সৃষ্টি করেছে। সেকুলারিটি হলো রাষ্ট্র কর্তৃক ধর্ম বিষয়ে নিরপেক্ষতা যেখানে সমস্ত ধর্মই সমান অধিকার ও সুযোগের অধিকারী, এইরূপ মহানুভবতা স্মরণাতীতকাল থেকেই একমাত্র হিন্দু ঐতিহ্য।

হিন্দুবহুল দেশ ভারতবর্ষে এ প্রসঙ্গে সংবিধানে সেই সম্ভাবনাই অন্তর্নিহিত ছিল। অধিকন্তু ধর্মীয় সংখ্যালঘুদের জন্য বিশেষ অধিকার সংবিধানে সুনিশ্চিত করা আছে, যা কিন্তু সংখ্যাগুরু হিন্দুদের দেওয়া হয়নি। এইসব বিশেষ অধিকার থাকা সত্ত্বেও লুকিয়ে অসৎভাবে সেকুলার শব্দ সংবিধানে সংযোজনের পেছনে কী উদ্দেশ্য থাকতে পারে? এই অসদুপায়টি অবলম্বন করা পরবর্তী সময়ের সামাজিক ও রাজনীতির পুঙ্খানুপুঙ্খ বিচার বিশ্লেষণ করলে পরিশেষে প্রমাণ হয় যে, এই প্রতারণাটি দেশে সাম্প্রদায়িক ও বিভেদকামী রাজনীতি করার উপযোগী পরিবেশ গড়ে তোলার উদ্দেশ্যে করা হয়েছে এবং সেইসব আলোচ্যসুচিগুলিকে প্রতিপালন ও রক্ষা

দেশের অখণ্ডতা ভঙ্গকারী শক্তিগুলি যারা ভারতবাসীকে পরস্পরের সঙ্গে লড়িয়ে দিতে সচেষ্ট এবং সেকুলারিজম বিপদগ্রস্ত বলে ক্রমাগত প্রতারণা করে চলেছে তাদের বর্জনের মধ্য দিয়ে এই জাগ্রত ভারত সাম্প্রদায়িক রাজনীতির নাগপাশ থেকে দেশকে মুক্ত করতে প্রস্তুত।

করে যাওয়া যার ফলে দেশের অখণ্ডতা ভেঙে এক ঐক্যনাশক সমাজ গড়ে তোলা যায়। এইরকম অশুভ চিন্তাধারার পদক্ষেপে সমাজে কীরূপ প্রভাব ফেলে? সেকুলারিজমের নামে বিভেদকামী সাম্প্রদায়িক আলোচ্যসূচিগুলিকে এভাবেই নির্লজ্জভাবে প্ররোচিত ও প্রভাবিত করা হচ্ছে। অন্যদিকে যারা এদের কুকর্মকে প্রকাশিত করে মুখোশ খুলে দিচ্ছে তাদের সাম্প্রদায়িক তকমা লাগিয়ে দেওয়া হচ্ছে।

এক সেকুলার প্রধানমন্ত্রী নির্লজ্জভাবে সর্বসমক্ষে সাম্প্রদায়িক বিবৃতি দিয়েছেন 'অল্পসংখ্যকরাই (অর্থাৎ মুসলমান সম্প্রদায়) সম্পদের (দেশের) এক নম্বরের অধিকারী'। সংবিধানসম্মত না হওয়া সত্ত্বেও এবং সুপ্রিমকোর্ট ও হাইকোর্ট দ্বারা একাধিকবার প্রত্যাখান হওয়া সত্ত্বেও কিছু সেকুলার দলের নেতা প্রায় সময়েই অল্পসংখ্যকদের জন্য ধর্মের ভিত্তিতে সংরক্ষণ দেওয়ার পক্ষে ওকালতি করে থাকেন। যদি ভারত সত্যিই এক সেকুলার দেশ হয়ে থাকে সেক্ষেত্রে সরকার হজ-অনুদান দেবে কেন? কতিপয় ইসলামিক বিশেষজ্ঞ দাবি করেন যে নিজ সামর্থ্যে হজ করার প্রচেষ্টাই একমাত্র ইসলামসম্মত এবং এজন্য কোনো ইসলামিক দেশে এইরূপ কোনো অনুদান দেওয়ার রেওয়াজ নেই। স্বাধীনোত্তর ভারতবর্ষে এই ধরনের প্রচলন একই সঙ্গে সেকুলার বিরোধী ও ইসলাম বিরোধী নীতি। অবধারিতভাবে ভোটব্যাঙ্ক রাজনীতির পক্ষপাতিত্বের কৌশলনীতিতে ধর্মভিত্তিক ছাত্রবৃত্তি দেওয়া, স্কুলপড়ুয়া মুসলমান ছাত্রীদের সাইকেল দান, মুসলমান মেয়েদের বিবাহে আর্থিক অনুদান ইত্যাদি। এক্ষেত্রে 'সেকুলারিজম বিপদগ্রস্ত' চিৎকারকারীরা স্বাভাবিক ভাবেই চোখ বন্ধ করে রাখে। একইরকম ভাবে হজ অনুদানের মতো খ্রিস্টান ভোটের উদ্দেশ্যে কোনো সেকুলার রাজ্য সরকারি খরচে জেরুজালেম নিয়ে যাওয়ার অনুদানও ঘোষণা করে থাকে। কিন্তু তখনও 'সেকুলারিজম বিপদগ্রস্ত' চিৎকারকারী সেকুলারবাদীদের কোনো অস্তিত্ব পাওয়া যায় না। কোর্টে নিষেধাজ্ঞা থাকা সত্ত্বেও একটি সেকুলার রাজ্য সরকার তিন তিন বার মুসলমানদের জন্য সংরক্ষণের ঘোষণা করেছে। তখনও সেকুলারবাদীদের মুখে 'রা' কাড়েনি। সরকারের হিন্দু মন্দিরগুলির ওপর নিয়ন্ত্রণ আছে কিন্তু অন্য ধর্মাবলম্বীদের উপাসনাস্থলের দান-দক্ষিণার ওপর নজর থাকে না, এই কী সেকুলারিজম্? রাষ্ট্রকর্তৃক ধর্মের ভিত্তিতে পক্ষপাতিত্ব করা সেকুলারিজমের নীতিতে গ্রহণযোগ্য নয়, কিন্তু সেকুলারিজমের রক্ষাকর্তারা আশ্চর্যরকম ভাবে এক্ষেত্রে নীরব থাকে। কিছুদিন আগে বেঙ্গালুরুর স্পনসর করা সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার সংবাদ পরিবেশনের প্রতিক্রিয়ায় এক ব্যঙ্গাত্মক পোস্ট সোশ্যাল মিডিয়ায় ভাইরাল হয়েছে 'হিংস্র জমায়তের কোনো ধর্ম জানা নেই কিন্তু মন্দির রক্ষায় শান্তিপূর্ণ মানবশৃঙ্খল গঠনকারীদের ধর্ম জানা আছে'-- ভারতীয় সেকুলার জার্নালিজমের চরিত্রকে উন্মুক্ত করে ফেলেছে। এক বিখ্যাত কানাডিয়ান সাংবাদিক তারেখ ফতেহর পোস্ট সোশ্যাল মিডিয়ায় ঘুরপাক খেয়ে চলেছে 'ভারত একমাত্র এক বিশাল সভ্য দেশ যেখানে শেখানো হয় নিজেদের ঐতিহ্যকে ঘৃণা করতে এবং একে ধ্বংস করতে আসা

আক্রমণকারীদের মহিমাকীর্তন করতে। এই অযৌক্তিক ব্যাখ্যাকে সেকুলারিজম বলা হয়।' (India is the only major civilisational country where you are taught to hate your heritage and glosify the invadors who came to de-stroy if. And this (absurdity) is called 'secularisom')

ভারতীয় সেকুলারবাদী দিগ্‌গজদের গঠিত বিধানের সারবত্তা হলো হিন্দুত্ব, হিন্দু বিশ্বাস ও হিন্দু রীতিনীতির বিলোপ করা। ওবেসির মতো কট্টর সাম্প্রদায়িকের সঙ্গে একমঞ্চে দাঁড়ালেও সে সেকুলার, অন্যদিকে যোগীজীর মতো তপস্বীর সঙ্গ সাম্প্রদায়িক খেতাব পেয়ে থাকে। মন্ত্রীদের দরগাতে চাদর চড়ানো (সুফি প্রথা), সরকার প্রযোজিত ইফতার পার্টির আয়োজন সেকুলারবাদের লক্ষণ, কিন্তু মন্দিরের প্রাণ প্রতিষ্ঠার পূজায় অংশগ্রহণ আগাগোড়াই এক সাম্প্রদায়িকতা যা 'সেকুলারিজম বিপদগ্রস্ত' এই স্লোগানের ভাঁড়ার ভর্তি করে। এই চলমান জগৎজুড়ে ঈশ্বর ব্যাপ্ত হয়ে আছেন ('ঈশাবাস্যমিদং সর্বম যৎকিঞ্চিৎ জগত্যাম জগৎ')। এই বিশ্বাসের কারণে ভারতীয় প্রথায় সমস্ত শুভ কাজ শুরুর আগে দিব্য শক্তির পুনঃপ্রতিষ্ঠা ও পুনঃআহ্বান করার রীতি আবাহমানকাল ধরে চলে আসছে। এটাই সনাতনী আধ্যাত্মিকতা প্রকাশের স্বরূপ, কোনো সাম্প্রদায়িক ক্রিয়াকলাপ নয়। আমাদের জ্ঞানলব্ধ উত্তরাধিকার থেকে প্রাপ্ত বিশ্বাস যে, বিভিন্ন উদ্যোগ বিভিন্ন দেবতার আশীর্বাদের দ্বারা সুরক্ষিত— সরস্বতী বিদ্যার দেবী, ধন্বন্তরী চিকিৎসার দেবতা, নটরাজ নৃত্য ও কলাবিদ্যার দেবতা, হনুমান মল্লযুদ্ধের, বিশ্বকর্মা কারিগরি কৌশলের ইত্যাদি। যে কোনো ধর্মবিশ্বাসী হোক না কেন, নিজ নিজ কার্যের শুভারম্ভে যুগ যুগ ধরে আমাদের এই উপাসনা রীতিগুলি চলে আসছে, এরূপ অভ্যাস সেকুলারিজমের বিরোধিতা নয়। কিন্তু বিপজ্জনক মৌলবাদী, জিহাদি অথবা ভারতের অখণ্ডতা ভঙ্গ প্রয়াসী শক্তিগুলি এই প্রচলিত রীতি পরম্পরাকে বর্জন করে পরিবর্তে বিকৃত ও কলঙ্কিত করে সাম্প্রদায়িকতা হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করার প্রচার করে চলেছে। উপরন্তু সংখ্যালঘু ও সাম্প্রদায়িক উস্কানি দিয়ে ভোটভিখারি রাজনৈতিক দলগুলি এদের তত্ত্বকে সমর্থন করে চলেছে অথবা ইচ্ছাকৃতভাবে উপেক্ষা করে থাকে।

আমার পরিচিত এক সাংবাদিক একজন মুসলমান কন্ট্রাক্টরকে তার নতুন বাড়ির আসবাবপত্র তৈরির বরাত দিয়েছিল। এই কাজ চলাকালীন সময়ে, ওই কন্ট্রাক্টর একদিন জানালো যে তার কর্মচারীরা আগামীদিন কাজে আসবে না, কারণ ওরা বিশ্বকর্মা পূজা করবে। তারপর সেই মুসলমান কন্ট্রাক্টর সাংবাদিক বন্ধুর কাছে বিশ্বকর্মা পূজার মহিমা ও তাৎপর্য ব্যাখ্যা করেছিল। সাধারণ ভারতবাসীর কাছে ভারতীয় বিশ্বাস কেমন সহজ কাজ, কিন্তু সেকুলার জামাতদের কাছে এটা রকেট বিজ্ঞানের মতোই জটিল অথবা না বোঝার মতো দাম্ভিক মনোভাব কাজ করে। নতুন ব্যাখ্যায় সেকুলারিজমের পরিভাষার পুনর্মূল্যায়ন বাধ্যতামূলক হয়ে উঠেছে, এখন হিন্দুধর্মের অন্ধ বিরোধিতা করাই সেকুলাররিজম।

সুপ্রাচীন অধ্যাত্ম নির্ভর ভারতীয় জীবনদর্শন স্বকীয়তায় সামগ্রিক এবং অবিচ্ছেদ্য। বিদেশে এই ভাবধারাকেই 'হিন্দু' নামে জানে। একই ভূখণ্ড থেকে দেশভাগের পরিণতিতে উপস্থাপিত ভারত ও পাকিস্তান, দুটি ভিন্ন সাংবিধানিক কাঠামোর অধীনে জনগণের জীবনযাপনের শর্তসাপেক্ষের এক উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত, 'সর্ব ধর্ম সমভাবঃ' আমাদের স্বাভাবিক প্রবণতা। যেখানে নিজের দেশের প্রতিটি নাগরিকের প্রতি (ধর্ম নিরপেক্ষভাবে) ঔদার্য দেখাতে পাকিস্তান ব্যর্থ, ভারত যা করে দেখাতে পারছে। ভারতীয় সংবিধানের এই উদারতার কারণ তার হিন্দু শিকড়, যেখানে পাকিস্তানের সংবিধানের অর্থ যদি সব ধর্মকে সমদৃষ্টিতে দেখবার মন্ত্র হয় তবে এই দেশের হিন্দুরাই সেটা করে থাকে। আমাদের বিবেক এই ভাবধারায় উর্বর 'একং সৎ বিপ্রাঃ বহুধা বদন্তি' অর্থাৎ সত্য একটাই, বুদ্ধিমানেরা বিভিন্নভাবে এর প্রকাশ করেন।

১৮৯৩ সালে স্বামী বিবেকানন্দ চিকাগোয় বিশ্বধর্ম সম্মেলনে বক্তৃতায় জানান যে, ভারত 'Mother of all religions', ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে কীভাবে বিভিন্ন ধর্মে বিশ্বাসীরা বিভিন্ন সময়ে ধর্ম পরিবর্তনের ভয়ে ও রাজনৈতিক নির্যাতন ও হত্যা এড়াতে ভারতে আশ্রয় নিয়েছে এবং তাদের উত্তরসূরিদের জন্য ধর্মরক্ষার অভয়ারণ্যে মুক্তভাবে তাদের ধর্ম পালন ও জীবনশৈলীতে জীবনযাপন করতে। হিন্দুধর্মের মহত্ত্বের বর্ণনায় তিনি আরও জানিয়েছিলেন যে, আমরা হিন্দুরা সহিষ্ণুতার সর্বোচ্চ সীমায় সর্বধর্মের সত্যরূপ স্বীকার করে থাকি, আমরা বিশ্বাস করি 'বাঁচ, শ্বাস নাও, গ্রহণ করো এবং স্বীকার করো'। গত কয়েক দশক ধরে এক ষড়যন্ত্রের প্রয়াস চলে আসছে উদারমনস্ক হিন্দুত্বকে এক সাম্প্রদায়িক তকমায় চিহ্নিত করে তুলতে, অন্যদিকে গোঁড়া সাম্প্রদায়িক চিন্তাধারাকে সেকুলার রূপে প্রকাশ করতে। এই দুষ্প্রচার আমার কাছে তখনই সহজবোধ্য হয়ে উঠলো যখন আমাদের এক সঙ্ঘ কার্যকর্তার যুবতী বোনের পাঠানো একটি চিঠি পড়তে পেলাম। লেখিকা হিসেবে আত্মপ্রকাশের ইচ্ছা জানাতে আমি তাকে পরামর্শ দিয়েছিলাম যে আমাদের মধ্যে যে বিষয়বস্তু নিয়ে আলোচনা হয়েছে এ প্রসঙ্গে তার লিখিত মতামত জানাতে। সে লিখেছে— 'আমি একজন ভারতীয়, কিছুদিন আগে পর্যন্ত আমার কাছে এর অর্থ ছিল আমি ভারতে বাস করি। আমার মনে হতো এটা এক ভৌতিক/শারীরিক, ভৌগোলিক এবং এমনকী সম্ভবত এক সাংস্কৃতিক বাস্তবতাও। আমার বিশ্বাস ছিল আমি যে একজন হিন্দু সেটা আমার একান্তই ব্যক্তিগত, এর সঙ্গে আমার জাতীয় পরিচয়ের সঙ্গে মেশানো নিষ্প্রয়োজন। কিছুদিন আগে পর্যন্ত আমি কখনও ভাবতেই পারিনি আমার বিশ্বাসের সঙ্গে আমার জাতীয় পরিচয় মিশিয়ে এক করে দেখতে। কিছুদিন আগেও আমি অত্যন্ত দৃঢ়ভাবে ভেবেছি এই দুটোকে একত্রে মিশিয়ে দেখা উচিত হবে না। আমাদের মতো 'শহুরে, আধুনিক, প্রগতিশীল' ভারতীয়দের শেখানো হয় আমাদের ধর্মীয় পরিচয়কে পৃথকভাবে

দেখতে। শেখানো হয় দেশপ্রেম ভালো, কিন্তু শেখানো হয় কর্মক্ষেত্রে অথবা সার্বজনিক সমাবেশে আমাদের হিন্দু পরিচয় প্রকাশ না করতে। কারণ এতে অন্য ধর্মবিশ্বাসী ভারতীয়দের আঘাত লাগতে পারে। একজন হিন্দু ও একজন ভারতীয় দুটি ভিন্ন সত্তা এবং এদের পৃথক করেই রাখা উচিত। এই দুইয়ের মিশ্রণ হলে অন্য ধর্মের বিশ্বাসীদের সঙ্গে সীমারেখা টানা হয়ে যায়, সাম্প্রদায়িক মনে হয়। আমাদের শেখানো হয়েছে সব ধর্মকে সমান চোখে দেখতে। আমাদের আরও শেখানো হয়েছে ভারত এক বৈচিত্র্যপূর্ণ সংস্কৃতির দেশ।'

সেকুলারিজমকে স্বীকৃতি দিতে ধর্মবিরোধী, অধার্মিক বা নাস্তিক হওয়ার প্রয়োজন হয়নি। বাস্তবে একজন ব্যক্তির সেকুলার হওয়া অসম্ভব, যদি কেউ এমন দাবিও করে থাকে তবে সে হয় মিথ্যা বলছে অথবা প্রতারণা করছে। সব মানুষের জীবন কিছু অথবা কোনো অন্তর্নিহিত দর্শন অথবা ধর্ম দ্বারা চালিত হয়। একজন মানুষের জীবনশৈলী হতে পারে হিন্দু, ইসলাম, শিখ, পারসি, জিউ, জৈন, বৌদ্ধ, বৈষ্ণব, শৈব্য, দেবীউপাসক, প্রকৃতি উপাসক বা নাস্তিক। প্রতি ব্যক্তির অধিকার ও স্বাধীনতা আছে নিজ ধর্ম পালন করতে পারার সেক্ষেত্রে সেকুলারিজমের অস্তিত্ব বিপন্ন হয় না। সেকুলারিজম আশা করে সমস্ত ধর্ম সমানভাবে মূল্যায়ন করা হোক। যখন সমস্ত ধর্মকে সমান এবং সমস্ত ধর্মকে সত্য ভাবে তখন সে তো একজন হিন্দু। আচার্য বিনোবাভাবে একটি সরল ব্যাখ্যায় স্পষ্ট করেছেন সমস্ত বিষয়টিকে ঃ একমাত্র এই পথেই মুক্তি মিলবে— এটি অহিন্দু ভবনা আর এপথেও মুক্তি পাওয় যাবে —এটি হিন্দু ভাবনা।'

আমি বিশ্বাস করি যখন রাষ্ট্র অবশ্যই সেকুলার, সেক্ষেত্রে প্রয়োজন নেই কোনো ব্যক্তির সেকুলার হওয়ার, যেমন স্ট্রেট ট্রান্সপোর্ট কর্পোরেশন অবশ্যই সেকুলার, কিন্তু যদি দাবি করা হয় এরজন্য এর চেয়ারম্যানকেও সেকুলার হতে হবে তা যুক্তিহীন। সমস্ত যাত্রীকে স্ট্রেট ট্রান্সপোর্ট অবশ্যই সমদৃষ্টিতে দেখবে, কিন্তু যখন দাবি করা হবে সমস্ত যাত্রীকে সমান সার্ভিস দেওয়া সম্ভব, যখন চালক ও কন্ডাক্টারদের ধার্মিক হওয়া চলবে না, এটা অকল্পনীয়। আমরা দেখে থাকি যে অধিকাংশ ভারতীয় চালক যাত্রা শুরুর আগে বিগ্রহের উদ্দেশে প্রণাম জানায়, এমনকী যন্ত্রযানটিকেও প্রণাম জানায়, এইক্ষেত্রে কীভাবে সেকুলারিজম বাধা প্রাপ্ত হয়? স্ট্রেট ট্রান্সপোর্টের তরফ থেকে সেকুলারিজমের অর্থ সকলের জন্য সমান ব্যবহারিক সুযোগের অধিকার, কন্ডাক্টার সমান ভাড়া নেবে এবং বসার ক্ষেত্রে কোনো প্রকার বৈষম্য দেখাবে না, অবশ্য বয়স্ক নাগরিক, মহিলা এবং বিশেষ দরকারি ব্যক্তিকে ছাড়া। কিন্তু ধর্ম অনুসারে কেউ বিশেষ অধিকার দাবি করলে সেক্ষেত্রে সেকুলারিজম চূড়ান্ত বোধহীনই মনে হয়।

সেই বোন এই বলে তার চিঠি শেষ করছিল—

'কিছুদিন আগে আরএসএসের ড. বৈদ্যর সঙ্গে আমার আলোচনা হয়েছিল। এই আলোচনা থেকে আমি উপলব্ধি করেছি যে প্রকৃত সত্য থেকে আমার জ্ঞান কত দূরে রয়েছে। এই প্রথম আমি জানলাম ও উপলব্ধি করতে পারলাম 'হিন্দু' কথার অর্থ কী? ভারতীয় অথবা ইন্ডিয়ান থেকে আদৌ সেই ধারণা পৃথক নয়, প্রকৃতপক্ষে একই বিষয়। হিন্দুত্ব (হিন্দুইজমের এক সরল অনুবাদ। যদিও যথার্থভাবে করা হয়নি) জীবনযাপনের এক পদ্ধতি। পৃথিবীর এই অঞ্চলের জীবনশৈলী গঠিত হয়েছে রিলিজিয়নের জন্মের বহু আগে থেকেই। হিন্দুত্ব এমন এক জীবনদর্শন যা ক্রমশ সমৃদ্ধ হয়েছে, রিলিজিয়ন এই দেশকে দুভাগ করার পরবর্তী সময়েও। আজ রিলিজিয়নের কারবারীদের প্রসার সত্ত্বেও হিন্দুত্বই এখানকার জীবনদর্শন হিসেবে থেকে যাবে। ভারত অথবা ইন্ডিয়া এই জীবনশৈলীর কেন্দ্র। ভারতাত্মা বৈচিত্র্যের উপভোগের মধ্য দিয়ে স্পন্দিত ও সমৃদ্ধ হয়ে চলেছে এবং হিন্দুরা এই বৈচিত্র্য উপভোগ করে ও অনুভব করতে পারে এর অন্তর্নিহিত একাত্মতাকে, সুস্পষ্ট পার্থক্যের মধ্যেও। ভারত ভৌগোলিক সীমানার মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকেনি। ভারত সর্বজনেরই ও মানবতার এক মতবাদ যা উপর্যুপরি হস্তক্ষেপ সত্ত্বেও প্রজন্মের পর প্রজন্ম সহজে অতিক্রম করে চলেছে। আর্মেষ্টি রেমেনের মতে— রাষ্ট্র এক আধ্যাত্মিক আদর্শের মতো এবং শুধুমাত্র একটি গোষ্ঠী নিয়ন্ত্রিত ভূখণ্ডের ব্যাপ্তি দিয়ে বিচার্য হয় না। রাষ্ট্র এক আত্মা। ব্যক্তির মতো রাষ্ট্রও বহু বছরের কঠোর পরিশ্রম, ত্যাগ ও নিষ্ঠার ফসল। আমাদের রাষ্ট্রের মতো সত্যও অমিল। অনুরূপভাবে হিন্দু অস্তিত্বও ঈশ্বরের উপাসনা ছাড়িয়ে বহুদূর বিস্তৃত। রাষ্ট্রের প্রয়োজনেই হিন্দুত্বের গুরুত্ব। আমি একজন হিন্দু, এটাই আমাকে ভারতীয় হিসেবে গড়ে তুলেছে, তেমনি আমি একজন ভারতীয় যা আমাকে হিন্দু পরিচয় দিয়েছে এবং সেখানে আমি করজোড়ে অথবা নতমস্তকে উপসনা করি না কেন তার সঙ্গে এর কোনো সম্পর্ক নেই।

দেশের অখণ্ডতা ভঙ্গকারী শক্তিগুলি যারা ভারতবাসীকে পরস্পরের সঙ্গে লড়িয়ে দিতে সচেষ্ট এবং সেকুলারিজম বিপদগ্রস্ত বলে ক্রমাগত প্রতারণা করে চলেছে তাদের বর্জনের মধ্যদিয়ে এই জাগ্রত ভারত বর্তমানে সাম্প্রদায়িক রাজনীতির নাগপাশ থেকে দেশকে মুক্ত করতে প্রস্তুত। আমাদের চিরাচরিত মূল্যবোধ বহুত্ব, বৈচিত্র্য এবং একতার সূত্রে সমস্ত ভারতবাসী ঐক্যের বন্ধনে শক্তিশালী হয়ে উঠছে। এই কর্মসূচি জাতীয় স্বার্থে, এমনকী ইসলাম অথবা খ্রিস্ট বিশ্বাসী জনগণের জন্যও প্রয়োজন। এই ভণ্ড ও কৃত্রিম সেকুলারিজমকে অকেজো করার সাফল্য দেখতে পাওয়া যাচ্ছে, সমাজকে অন্তসারশূন্য এবং আমাদের অমূল্য ঐতিহ্যকে লুণ্ঠন করতে যারা সচেষ্ট হয়ে উঠেছিল। যখন এই স্বার্থপর ও সমাজবিরোধী ভণ্ডরা 'সেকুলারজিম বিপদগ্রস্ত' বলে চিৎকার করে তার সর্বজনের 'সিউডো-সেকুলারিজম' এবং তার উপর নির্ভরশীল কারবার বিপদগ্রস্ত। দেশ এই ধরনের সেকুলারিজম থেকে মুক্ত হয়ে একতা, অখণ্ডতা ও সৌভ্রাতৃত্বকে শক্তিশালী করে তুলছে।

(লেখক রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের সহ সরকার্যবাহ)

বিশেষ নিবন্ধ

বর্তমান ভারতের দুর্দশার প্রধান কারণ ইংরেজ ও নেহরু সম্প্রদায়

যে জাতীয়তাবোধ ও স্বদেশ চেতনার উদ্বোধন ঘটেছিল স্বামী বিবেকানন্দের শিকাগো প্রত্যাগমনের পর (১৮৯৭) তার গতি ভিন্ন পথে ধাবিত হলো গান্ধীজীর নির্জীব অহিংস রাজনীতির ফলে। এই ধারাকে টেনে নিয়েই জওহরলাল নেহরুদের নেতৃত্বে স্থাপিত হলো বিজাতীয় সেক্যুলার প্রতিষ্ঠানের। বর্তমান ভারতের দুর্দশার এটাই প্রধান উৎস।

পুলকনারায়ণ ধর

ভারতবর্ষের যে ইতিহাস আমরা 'মুখস্থ করিয়া পরীক্ষা দিই' সেই ইতিহাসকে রবীন্দ্রনাথ 'দুঃস্বপ্নের কাহিনি' বলে অভিহিত করেছেন। 'কাটাকাটি' ও 'খুনোখুনি'র ইতিহাসকে ভারতবর্ষের সাধারণ মানুষের ইতিহাস বলে গণ্য করা যায় না। রবীন্দ্রনাথের বিচারে সাধারণ ভাবে আর্য ও অনার্যদের যে স্বাভাবিক সমন্বয় 'দ্বেষ' ও ভালোবাসার মধ্য দিয়েই গড়ে উঠছিল তা কোনো আকস্মিক জোর জবরদস্তির চাপে সংঘাতের পথে চলে গিয়েছিল এবং পরিণামে সমস্ত সমাজ ও রাজনীতিকে বিষিয়ে তুলেছিল। 'বুদ্ধং শরণং গচ্ছামি'র মন্ত্রে যে ঐক্যতান গড়ে তোলার প্রয়াস শুরু হয়েছিল পরিণামে সেখানেও অনৈক্য ও দ্বন্দ্বই প্রকট হয়েছিল।

শক্-হুণ-পাঠান-মোগল কালের প্রবাহে এক দেহে লীন হয়ে গেলেও বৈচিত্র্যের মাঝে ভারতবাসীর ঐক্য বারবার ব্যহত হয়েছে। এই বিপর্যয়ের জন্য বাইরের শত্রু নয়, আমাদের অন্তরের শত্রুকেই রবীন্দ্রনাথ দায়ী করেছেন। হানাহানি ও বিদ্বেষের বীজ যদি মনের মধ্যে থাকে তবে ভারতবাসীর আপাত ঐক্য ও মিলন হবে সুবিধার

ঐক্য ও মিলন। পারস্পরিক লাভ লোকসানের নিক্তিতে বিচার করে যদি ভ্রাতৃত্ব ও প্রীতির সম্পর্ক স্থাপিত হয় তবে অন্য একটি 'সুবিধার ধাক্কায়' তা বেশিদিন টিকবে না। এই সত্যটা যে আজকের ভারতবর্ষে কত বড়ো সত্য তা আমরা প্রতি পদে প্রতি মুহূর্তে অনুভব করছি। ইংরেজ এদেশে আসার আগে যে অনৈক্য ও বিভেদের চেহারা ভারতবাসীর ছিল ইংরেজ আসার পর তা আধুনিক চেহারা পেল। ইংরেজ ভারতের মাটিতে তার পতাকা প্রোথিত করেছিল। ভারতের মাটি তার কাছে ছিল বিদেশি মাটি। এই মাটি তার রক্তে মেশেনি। ভারতীয় সমাজ ও সংস্কৃতির সঙ্গে তার কোনো সমন্বয় সাধনের প্রয়াস ছিল না। তাই ভারতীয়দের মধ্যে তার শিক্ষা সংস্কৃতির ধারাই ইংরেজ প্রবাহিত করেছিল।

ঔপনিবেশিক স্বার্থে ইংরেজ প্রথমেই যে কাজটি সম্পন্ন করল তা হলো ভারতের বিচ্ছিন্ন দেশগুলিকে শাসনের একটি সূত্রে আবদ্ধ করা। এই উদ্দেশ্যকে বাস্তবায়িত করতে উন্নত করা হলো যোগাযোগ ব্যবস্থা। রাস্তাঘাট ও রেলপথের উন্নতি ঘটিয়ে ইংরেজ তার শাসনের রজ্জুতে সারাদেশকে আষ্টেপৃষ্ঠে বেঁধে ফেলল। কিছু অবাধ্য ও একগুঁয়ে দেশীয় শাসককে জব্দ করতে তার বেশি সময় লাগেনি। আর এই কাজে তার সহায়তা করেছিল ভারতবাসীর অনেকেই। অর্থাৎ আমাদের অন্তর্গ্লানি ও অন্তর্দ্বন্দ্বই ছিল সে সময়ের ইংরেজ শাসন প্রতিষ্ঠার প্রধান সহায়ক। ইংরেজ ভারতবর্ষে যে ঐক্য প্রতিষ্ঠা করেছিল সেই ঐক্যে কোনো প্রাণের ঐক্য ছিল না। সেই ঐক্য ভালোবাসার ও সম্প্রীতির ঐক্য নয়। সেই ঐক্য ছিল নিছক শাসনতান্ত্রিক বন্ধন। এই বিশাল দেশকে পরিচালনার জন্য যে শাসনতান্ত্রিক পরিকাঠামো ইংরেজ গড়ে তুলেছিল তার মধ্যে তার স্বার্থবোধ ও বেনিয়াবুদ্ধির পরিচয় পাওয়া যায়, কিন্তু ভারতবাসীর নিজস্ব ঐকান্তিক ঐক্যবোধের পরিচয় পাওয়া যায় না। সমস্ত ভারতবাসীকে ঐক্যবদ্ধ করে একটি বিপুল জাতি গঠন ইংরেজের উদ্দেশ্য ছিল না। ইংরেজ এদেশে না এলেও আমাদের মধ্যে একটা সর্বভারতীয় চেতনা বা ঐক্য গড়ে উঠত। সে চেতনা হয়তো নানা দ্বন্দ্ব ও সংঘাতের মধ্য দিয়েই গড়ে উঠত কিন্তু তা কখনোই ইংরেজের তৈরি করা চালাকির ঐক্য হতো না। হতে পারত যে আধুনিক জগতের পরিচয় আমরা পেতাম আরও অনেক বছর পরে। তবে ইংরেজ শাসন ভারতে তথা বঙ্গপ্রদেশে ক্ষয়িষ্ণু মুসলমান অপশাসনের ওপর যবনিকা টেনে ছিল এবং এর ফলে সাধারণ মানুষ স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলেছিল ঠিকই, কিন্তু তা ছিল সাময়িক । মন্দের ভালো। কিন্তু এই নতুন শাসনই হলো আবার দেশের সাধারণ মানুষের কাল। নিজস্ব সংস্কৃতি ও ধর্মকে বিসর্জন দিয়ে ভারতবাসী যখন ইংরেজের পেছন পেছন ছুটছে তখনই তার অনৈক্যের মাত্রা বেড়েছে। আধুনিক-অনাধুনিক, শিক্ষিত-অশিক্ষিত, সাহেব-বাবু প্রভৃতি নতুন নতুন সমাজ বিভাজন (Social Stratification) সৃষ্টি করে মূল স্রোত থেকে বিচ্ছিন্ন বুদ্ধিজীবী সম্প্রদায়ের উদ্ভব ঘটল। আধুনিক আধা-ধনতান্ত্রিক মানসিকতা সম্পন্ন বুদ্ধিজীবীর জন্মলগ্ন ইংরেজ শাসনেই সূচিত হয়। পরবর্তীকালে এরাই ভারতের ভাগ্যবিধাতা ও রাজনৈতিক কর্মধারা রূপে মর্যাদা পেয়েছিল।

ইংরেজ এদেশের প্রাচীন রূপরেখাটি মুছে দেবার চেষ্টা করেছে। কৃষি ও ভূমি ব্যবস্থার নেতিবাচক পরিবর্তন ঘটিয়েছে। যতই উন্নতির জন্য রেললাইন নির্মাণ করুক তা ভারতবর্ষের মর্মভেদ করেই প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। কারণ সাধারণ ভারতবাসীর সামাজিক দাবি তার পেছনে আদৌ ছিল না। আশ্চর্য এটাই যে এই পুরানো কাঠামোর মধ্যেই ভারতীয় সমাজ গুঁটিপোকার মতো বাইরের সমস্ত আলোড়ন এড়িয়ে বেঁচে ছিল। ইংরেজ বুদ্ধিমান জাতি। দোকানদারি বুদ্ধির অধিকারী। তার কাজ চালাবার জন্য সে তৈরি করেছিল বুদ্ধিমান এক সম্প্রদায়কে যারা বিপুল ভারতীয় জনগণের অতি ক্ষুদ্র কিন্তু দুর্ধর্ষ এক বুদ্ধিজীবী সম্প্রদায়। ইংরেজ আমাদের সমাজের জাতপাতের মধ্যে অনৈক্যের সন্ধান শুরু করে। এর সঙ্গে কালক্রমে যুক্ত করল ধর্মের প্রশ্নকে।

ঔপনিবেশিক স্বার্থে ইংরেজ যে শাসনতান্ত্রিক ঐক্য প্রতিষ্ঠা করল তার বাঁধন ছিল শক্ত। এই ভৌগোলিক ঐক্যকে এক কেন্দ্রে ধরে রাখতে তাকে একই সঙ্গে হতে হয়েছে কঠোর ও নির্মম। পরবর্তীকালে যথার্থ বিবেচনা করলে মাঝে মাঝে শাসনসংস্কার করে ভারতীয়দের অংশগ্রহণের ক্ষেত্র সৃষ্টি করেছে। তাতে ঈপ্সিত বন্ধন ও শাসন হয়েছে আরও দৃঢ়। বিভিন্ন শাসনতান্ত্রিক সংস্কারের মাধ্যমে পরিশেষে স্বাধীনতার প্রাক্‌মুহূর্তে যে আইন (ভারত সরকার আইন ১৯৩৫) রচনা করল সেই আইনই হলো স্বাধীন ভারতের সংবিধান রচনার ভিত্তি।

ভারতের শাসন ব্যবস্থার মূল কাঠামো হচ্ছে কেন্দ্রপ্রবণ যুক্তরাষ্ট্রীয় কাঠামো। ইংরেজ এই কাঠামোর প্রণেতা। যতদিন পর্যন্ত কেন্দ্রীয় শাসকের এই শক্তি থাকবে ততদিন পর্যন্ত অবস্থার বিশেষ পরিবর্তন ঘটবে না। কিন্তু চালকের শক্তি ক্ষয়িষ্ণু হলে এলে তারা কেন্দ্রবিমুখ হয়ে উঠবে। বর্তমান ভারতীয় রাজনৈতিক সমাহারে এই প্রবণতা ক্রমশ প্রকট হচ্ছে। ইংরেজ শাসকদের একটা সুবিধার দিক ছিল এই যে তারা ভিন্ন দেশ থেকে এসেছিল এবং জনকল্যাণ নয়, শোষণই ছিল তার ঐকান্তিক উদ্দেশ্য। এদেশের মানুষের উন্নয়নের জন্য বা গণতন্ত্র স্থাপনে তাদের কোনো মাথাব্যাথা ছিল না। সুতরাং তারা তাদের কর্মসূচি রূপায়ণে শক্তি প্রয়োগ করতে দ্বিধা করেনি। একথা স্বীকার করতে হবে যে, যে উদ্দেশ্যে সাধনের জন্যই হোক ইংরেজ আপাতভাবে একটা আইনের শাসন প্রতিষ্ঠা করেছিল যা তার প্রতি সাধারণ মানুষের মান্যতা আদায়ে অনেকটাই সহায়ক হয়েছিল। এই আইনের শাসন কিন্তু বর্তমান অর্থে গণতন্ত্রের শাসন ছিল না।

বর্তমান স্বাধীন ভারতের সংবিধান অনুসারে গণতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থায় শক্তি প্রয়োগ করে উদ্দেশ্য চরিতার্থ করতে গেলে গোল বাঁধবে। শুধু শক্তির ওপর নির্ভর করে গণতন্ত্র বিরোধী ও বিচ্ছিন্নতাবাদীদের নিয়ন্ত্রণ করতে গেলে বিরোধ ও সমস্যা আরও জটিল আকার ধারণ করবে। ঘটনাচক্রে ইংরেজের তৈরি করা অনৈক্যের ফাটল দিনে দিনে বৃহৎ আকার ধারণ করেছে

এবং প্রকৃত গণতান্ত্রিক ঐক্যবোধের অন্তরায় হয়ে উঠেছে। আমাদের সংবিধান ও রাজনৈতিক সংস্কৃতির সঙ্গে এক বিরোধী সম্পর্কের সৃষ্টি হয়েছে। সংকীর্ণ আঞ্চলিকতাবাদ ও সম্পূর্ণ ঐক্যবদ্ধ ভারত— এই দুই ধারণা বিপরীত মেরুর দুই প্রান্তে অবস্থান করছে।

ইংরেজ শাসনে এক ধরনের ঐক্য অবশ্য হয়েছিল। কিন্তু এই ঐক্য ছিল প্রশাসনিক ও কৃত্রিম ঐক্য। স্বাধীনতার পর এই কৃত্রিমতা দূর করতে আমাদের রাজনৈতিক নেতাদের কোনো সদর্থক প্রচেষ্টা বা চিন্তা ছিল না। আমরা ইংরেজের তৈরি ভারত সরকার আইন ১৯৩৫-কে কুড়িয়ে পাওয়া চোদ্দ আনাতেই আহ্লাদিত হলাম। সময়ের অভাবেই এবং হঠাৎ করে ক্ষমতা হস্তান্তরের ধাক্কায় ব্যাপকভাবে জনগণকে সংবিধান রচনার মতো বিশাল ব্যাপারের সঙ্গে বাস্তব কারণেই যুক্ত করা যায়নি। কিন্তু সময়ের সঙ্গে সঙ্গে গণতন্ত্র ও জাতীয় চেতনাকে জনমানসে প্রোথিত করারও কোনো উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়নি। যে যেখানে যেমন ছিল তাকে সেখানে রেখেই ওপর থেকে ইংরেজের শিক্ষাধারায় গঠিত আমলাতন্ত্রের কৃত্রিম ভয়মিশ্রিত শাসনে তাদের ধরে রাখা হয়েছিল। কেতাবি গণতন্ত্রের বিস্তার যতই ঘটতে লাগল এই ভয়ও ততই গভীরতর হলো। কিন্তু এর প্রতিক্রিয়ায় যা তৈরি হলো তা জাতীয় ঐক্য চেতনা বা গণতান্ত্রিক চেতনা নয়। এর জায়গায় তৈরি হলো কর্তৃত্বকে অমান্য করার দুর্দম ইচ্ছা— যা গণতান্ত্রিক অধিকারের একমাত্র রূপ বলে বিবেচিত হলো। এই নেতিবাচক ভাবনাই সমাজের ও রাজনৈতিক কাঠামোর শিরায় প্রবাহিত হয়ে জন্ম দিচ্ছে সংকীর্ণ বিচ্ছিন্নতাবাদ।

একথা যথার্থ যে স্বাধীনতার পরে ভারতে যে রাজনৈতিক শাসনতান্ত্রিক পরিকাঠামো গ্রহণ করা হয়েছে তার চরিত্র তুচ্ছ করার নয়। কিন্তু সংবিধান বা শাসনকাঠামো শুধু কাঠামো হিসাবেই বিবেচ্য। প্রকৃত প্রয়োজন রাজনৈতিক 'ভিশন' বা দূরদৃষ্টি। কাঠামোতে প্রাণ প্রতিষ্ঠা করাই লক্ষ্য। অন্তরের ঐক্য বা সাংস্কৃতিক ঐক্য সাধনের প্রচেষ্টা কখনোই আমরা সেভাবে গ্রহণ করার কথা ভাবিনি। সবকিছুই ঠিক আছে বা ঠিকই থাকবে এটাই ধরে নিয়ে এতকাল চলে এসেছি। এটাই আমাদের ভাবনার বিন্যাস। এবং অবশ্যই তা ভ্রান্ত। উত্তর ভারত, দক্ষিণ ভারত, পূর্ব ভারত ইত্যাদি আঞ্চলিক স্বার্থ ও দ্বন্দ্বকে রাজনীতি ও ভোটের অঙ্গ সাধনে বড়ো স্থান দিতে দিতে গোটা দেশকে খণ্ড বিখণ্ড করার পরিকল্পনা রচিত হয়েছে। জাতীয় কংগ্রেস এই রাজীতির মুখ্য হোতা। এক ভারতের মধ্যেও আজ অসংখ্য ভারতের সৃষ্টি হয়েছে। এই অসংখ্য ভারত কোনো বৈচিত্র্যসমৃদ্ধ ভারত নয়। এই খণ্ডিত ভাবনার ভারতের নেতাদের মধ্যে একটি ঐক্যসূত্রই— তা হচ্ছে দুর্নীতি, লুণ্ঠন ও আঞ্চলিকতার আগ্রাসী মনোভাব ও কার্যক্রম। এই অসৎ ঐক্যবন্ধনে জড়িয়ে আজ উত্তরপূর্ব ভারতের অবস্থাও ভয়াবহ হয়ে উঠেছে। আমরা কাশ্মীরের বিচ্ছিন্নতা নিয়ে যতটা ভাবিত ও ক্রিয়াশীল উত্তর-পূর্ব ভারত--- মণিপুর, অসম, নাগাল্যান্ড, মিজোরাম, মেঘালয় নিয়ে আমরা তার সিকিভাগও ভাবিত নয়। এরা আমাদের প্রতিদিনের সংবাদপত্রেও সামান্য স্থান পায় না। এই অঞ্চলটি যে ভারতবর্ষেরই অংশ তা আমাদের চিন্তার বলয়ের মধ্যেই নেই। এটাই প্রকৃত বিপদ। স্বাধীনতার আগেও এই অঞ্চলগুলি নিয়ে কংগ্রেস বা গান্ধীজীর কোনো ভাবনাই ছিল না। কোনো পরিকল্পনা ছিল না। বর্তমান ভারতের অখণ্ডতা ও নিরাপত্তার ঘোর বিপদ উঁকি দিচ্ছে এই অভাবিত অঞ্চল থেকে।

স্বাধীনতার পরে সমগ্র ভারতের জন্য আমরা সুষম আর্থিক পরিকল্পনা গ্রহণ করিনি। যে অঞ্চলের রাজনৈতিক নেতারা যতটা প্রভাব খাটিয়ে যা গ্রহণ করতে পেরেছে সেটাই তাদের প্রাপ্য বলে বরাদ্দ হয়েছে। চাপসৃষ্টিকারী গোষ্ঠী হিসেবে Lob-bying হয়ে দাঁড়াল গৃহীত প্রচলিত পদ্ধতি। এই কারণে বিভিন্ন অঞ্চলের সমস্যা বাড়বার সঙ্গে সঙ্গে ও মানুষের ক্রমজাগরণের সঙ্গে সঙ্গে বঞ্চনার অভিযোগ বা বঞ্চনা বোধের যন্ত্রণাও ক্রমশ তীব্রতর হচ্ছে।

এই অবস্থায় আমরা আমাদের ভেতরের দুর্বলতাগুলি নির্মূল করার পরিবর্তে চাপা দেবার চেষ্টা করতে লাগলাম। বাহ্যিক গণতন্ত্রের চোখ ধাঁধানো ব্যবস্থা দিয়ে আমরা নিজেদের বোঝাবার চেষ্টা করলাম যে আমাদের গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা ক্রমশই আমাদের রক্তের মধ্যে চালিত হচ্ছে। কিন্তু এই ব্যবস্থার মূল্য থাকলেও আমাদের 'অন্তর্গত রক্তের ভিতর খেলা করে' অন্য এক চিন্তার স্রোত। অসম সমাজ ও আর্থিক বিন্যাসের ফাটল দিয়ে মাথাচাড়া দিয়ে উঠতে থাকে আত্মকেন্দ্রিকতা যার পরিণতি হচ্ছে আজকের সন্ত্রাসবাদ ও বিচ্ছিন্নতাবাদ। ভারতের রাজনীতিতে ভ্রান্তভাবনা ও পরিকল্পনার জন্য উপজাতীয়তাবাদ বা sub-nationalism-ই হতে চলেছে প্রধান চিহ্ন। একে রোধ করার মতন রাজনৈতিক দূরদর্শিতা বর্তমান প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর থাকলেও তাঁর বহু প্রতিবন্ধকতা বিদ্যমান। অপেক্ষাকৃত স্বাধীন এই রাজ্যগুলি আপন স্বাতন্ত্র্য বজায় রাখার জন্য বহিরাগত উপজাতি ও ইংরেজদের সঙ্গে অবিরাম যুদ্ধে লিপ্ত থেকেছে। ইংরেজ তাদের জোর-জবরদস্তি ধরে রাখতে পারলেও এদের একেবারে কবজা করতে পারেনি। খ্রিস্টান মিশনারিরা এই উপজাতি সমাজকে খ্রিস্টধর্মমুখী করে অনেকটা বশীভূত করতে সক্ষম হয়। এই প্রক্রিয়া ইংরেজের রাজদণ্ড স্থাপনের সহায়ক হয়েছিল। স্বাধীন ভারতের অঙ্গরাজ্যে পরিণত হলেও বহুকাল এরা স্বাতন্ত্র্য ও স্বাধীকার বজায় রেখেই চলেছে।

এই রাজ্যগুলি পরস্পরের সঙ্গে আদৌ সুসম্পর্কের বন্ধনে আবদ্ধ নয়। সমস্যা আঞ্চলিক। কিন্তু তা বৃহত্তর ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রীয় কাঠামো ও রাজনীতিরই সমস্যা। প্রচলিত যুক্তরাষ্ট্রীয় ব্যবস্থা আমাদের অঙ্গরাজ্যগুলির কতখানি ব্যবস্থা আমাদের অঙ্গরাজ্যগুলির কতখানি উন্নতি সাধনের সহায়ক হয়েছে সে সম্বন্ধে সন্দেহের অবকাশ আছে। ভারতীয় রাজনীতি চিরকালই আঞ্চলিক চরিত্র প্রধান। ভারতের অধিকাংশ মানুষের কাছেই উত্তরপূর্বাঞ্চল অপরিচিত দুর্গম অঞ্চল। এরা কতটা ভারতীয় সে সম্পর্কে আমাদের পরিষ্কার ধারণা নেই। যে ভারতীয় সংবিধানের মাধ্যমে আমরা তাদের ভারত রাষ্ট্রের অন্তর্ভুক্ত করেছি সেই

সংবিধান রচনার ক্ষেত্রে তাদের ভূমিকাকে কোনো গুরুত্ব দেওয়া হয়নি। এই বিচ্ছিন্নতার বীজ রোপণ করার জন্য দায়ী তৎকালীন নেতৃবৃন্দ যাঁদের পুরোধা ছিলেন জওহরলাল নেহরু ও সম্প্রদায়।

আজ নবজাগ্রত প্রজন্মের নতুন আশা-আকাঙ্ক্ষা ও আত্মমর্যাদাবোধ আর উপেক্ষণীয় নয়। জাতীয় অনুভূতির মূল স্রোতের সঙ্গে ওদের সমন্বয় ঘটাতে ব্যর্থ হলে তাদের মানসিকতায় বিপরীত স্রোতের টান হবে তীব্রতর। ওদের মধ্যে এই ধারণাই দৃঢ় হবে যে বড়ো জাতিগুলি অর্থাৎ অন্যান্য ভারতীয়রা তাদের শুধু 'সীমান্তরক্ষী' হিসেবেই দেখতে ভালোবাসে ও সেই ভাবেই গণ্য করে। এটা তাদের জাত্যভিমানে আঘাত করবে।

যুক্তরাষ্ট্রীয় হলেও আমাদের সংবিধান মুখ্যত কেন্দ্রাতিগ। অর্থাৎ অঙ্গরাজ্যগুলির অধিকার বা ক্ষমতা প্রায় নেই বললেই চলে। কেন্দ্রীয় সরকার যেমন শক্তিশালী হবে তার ক্ষমতার বহরও তেমন প্রকাশ পাবে। দুর্বল কেন্দ্রীয় শাসন মাঝে মধ্যে রাজ্যগুলিকে ভোটের স্বার্থে তোয়াজ করতে পারে। সেটা রাজনীতির অঙ্ক। পাশা চালাচালির কূটনীতি। কেন্দ্র শক্তিশালী ও বেপরোয়া হলে রাজ্যগুলির চরিত্র হয় সুবোধ বালকের মতন। কিন্তু অন্তর্নিহিত বিরোধের উপাদানগুলি সক্রিয় থাকে।

১৯৫০ সালের শেষের দিকে ভারতীয় রাজনীতি ও রাজনৈতিক ব্যবস্থা বিশ্লেষণ করে জনৈক বিদেশি গবেষকের ধারণা হয়েছিল যে ভারত কালে কালে হয় সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্নতার দিকে অথবা কোনো না কোনো ধরনের স্বৈরতান্ত্রিক এক কেন্দ্রিকতার দিকে ঝুঁকবে। সময়ের সঙ্গে সঙ্গে ভারতে কংগ্রেস দলের বন্ধন যতই শিথিল হয়েছে ততই জাতীয় অনৈক্যের চেহারা প্রকট হয়ে উঠেছে। এই অবস্থাটা রাজনৈতিক নেতাদের দৃষ্টিতে ধরা পড়ছে না। বিপদ এটাই। বাস্তবে আমরা জাতীয় ঐক্যসংক্রান্ত মূল প্রশ্নগুলি এড়িয়ে থেকে অভ্যস্ত। পরিবর্তে মাঝেমধ্যে সংবিধানের কাঠামোগত বা structural ত্রুটি বিচ্যুতির ওপর জোর দিয়ে নিশ্চিন্ত থাকছি। রাজনীতি যতই জনগণ থেকে বিচ্ছিন্ন হচ্ছে ততই সংবিধানের ত্রুটি আবিষ্কার করে রাজনীতিক নেতারা বা শাসকশ্রেণী সংবিধান সংশোধনে ব্যাপৃত হন। এই ভাবে মূল সংবিধানের যে শক্তি ছিল তা অনেকটাই ক্ষুণ্ণ করা হয়েছে। কংগ্রেসের ক্ষয়িষ্ণুতার সঙ্গে সঙ্গে রাজ্যে রাজ্যে যে আঞ্চলিকতার উদ্ভব ঘটেছে কেন্দ্রের সঙ্গে ক্ষমতার দ্বন্দ্বে লিপ্ত থেকে তারা নিজেদের অস্তিত্ব ও শক্তি প্রদর্শনেই মত্ত। সর্বভারতীয় প্রেক্ষাপটে এই রাজ্যভিত্তিক দলগুলির আদৌ কোনো কর্মসূচি বা দৃষ্টিভঙ্গি নেই। সুতরাং ধর্ম, জাতপাত ও উগ্র জাতিসত্তার আক্রমণে দেশের ও জাতির ঐক্য বিপন্ন। রাজ্যভিত্তিক ক্ষুদ্রদলগুলি এমন ধারণারই সৃষ্টি করেছে যে রাজ্যের হাতে যতবেশি ক্ষমতা থাকবে জাতীয় সংহতি ততই জোরালো হয়ে উঠবে। এই ভাবনা অতি সরলীকৃত। আসলে রাজ্যগুলিকে আঞ্চলিক দলগুলি তাদের রাজনৈতিক মর্যাদা ও দাপাদাপি বজায় রাখতে এবং কোনো সর্বভারতীয় দলকে রাজ্য রাজনৈতিক ক্ষেত্র থেকে দূরে রাখবার জন্যই অতি সংকীর্ণ বিষয়গুলিকেই প্রাধান্য দেয়। বিহারিরা শুধু বিহারের কথাই ভাববে, উত্তরপ্রদেশের মানুষ শুধু উত্তরভারত নিয়েই ভাববে, রাজস্থানের মানুষ শুধু রাজস্থানের কথাই ভাববে এইরকম একটা রাজনৈতিক সংস্কৃতি তৈরি হয়েছে যা জাতীয় ঐক্যের ক্ষেত্রে অত্যন্ত বিপজ্জনক।

দেশের ভালো করতে হলে বা জাতীয় সংহতি ও ভ্রাতৃত্ব স্থাপনে সংবিধানের এককেন্দ্রিক বা যুক্তরাষ্ট্রীয় চরিত্র বিশেষ কোনো বাধা নয়। সমস্যাটা আদৌ সেখানে নয়। প্রত্যেককে তার ন্যায্য প্রাপ্তির পথে বাধা সৃষ্টি না করলে বা অসম অর্থনৈতিক বিকাশকে উৎসাহিত না করলে রাজ্যে রাজ্যে অসন্তোষ ও অনুন্নয়নকে কেন্দ্র করে বিচ্ছিন্নতার রাজনীতি বা আঞ্চলিকতাবাদের উদ্ভব ঘটত না। সংবিধানের চরিত্র পরিবর্তন করে রাজ্যগুলিকে প্রভূত ক্ষমতার অধিকারী করে দিলেও মূল কারণগুলি দূর না করতে পারলে এই সমস্যার কোনো সমাধান হবে না। আশঙ্কা বরং এটাই যে এই পরিস্থিতিতে পুরোপুরি যুক্তরাষ্ট্রীয় ব্যবস্থা বা রাজ্যগুলিকে অবিমিশ্র ক্ষমতার অধিকারী করলে আরও বেশি বিপর্যয় ডেকে আনবে। আঞ্চলিকতার পথ আরও প্রশস্ত হবে।

জাতি হিসেবে আত্মপ্রকাশের পথে আমাদের একটি বড়ো অন্তরায় ছিল সাম্প্রদায়িক ধর্মাচার। বিশেষ করে হিন্দু ও মুসলমানদের মিথ্যা ধর্মরক্ষার রক্তাক্ত প্রয়াস আমাদের স্বাধীনতা আন্দোলনে ব্যাঘাত সৃষ্টি করেছে। রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ দুই ধর্মসম্প্রদায়ের মানুষের মিলনের প্রচেষ্টায় ধর্মীয় ঐক্যকে জাতীয় ঐক্যের সমার্থক করে তুলেছিলেন। গান্ধীজীর খিলাফত আন্দোলন এই প্রচেষ্টারই অঙ্গ। আবেগ উচ্ছ্বাস যখনই ক্ষীণ হয়ে এসেছে ধর্মীয় ঐক্যের আবেশ তিরোহিত হয়েছে। জাতীয় ঐক্যে ধস নেমেছে।

পরবর্তীকালে উপজাতি ও তপশিলি সম্প্রদায়ের মানুষদের নতুন বর্গীকরণ করে ভারতীয় জাতীয়তার প্রশ্নটিকে একেবারেই লোপাট করে দেবার চেষ্টা হলো। এই ব্যবস্থাটি অবশ্য ইংরেজ শাসকই করে গেছে। স্বাধীন ভারত পরাধীন ভারতের ইংরেজের নীতি ও কৌশলকেই সাংবিধানিক স্বীকৃতি দিয়েছে মাত্র। এই বিধ্বংসের জের আজও চলেছে অবিরাম গতিতে। যে জাতীয়তাবোধ ও স্বদেশ চেতনার উদ্বোধন ঘটেছিল স্বামী বিবেকানন্দের শিকাগো প্রত্যাগমনের পর (১৮৯৭) তার গতি ভিন্ন পথে ধাবিত হলো গান্ধীজীর নির্জীব অহিংস রাজনীতির ফলে। এই ধারাকে টেনে নিয়েই জওহরলাল নেহরুদের নেতৃত্বে স্থাপিত হলো বিজাতীয় সেক্যুলার প্রতিষ্ঠানের। বর্তমান ভারতের দুর্দশার এটাই প্রধান উৎস। ■

ALWAYS EXCLUSIVE
Vandana (NR) ®
SAREES • SUITS
Mfg. of Cotton Printed & Embroidary Sarees
Contact No. : 033-22188744 / 1386

ভারতকে শেষ করার চক্রান্ত চলছে

এখনই সাবধান হতে হবে

আবীর গাঙ্গুলী

ভারতবর্ষকে ইসলামিক দেশে পরিণত করার জন্য ভারতবর্ষ জুড়ে তবগিল-ই-জামাতের নেতৃত্বে কট্টর জঙ্গি সংগঠনগুলি একাযোগে পরিকল্পনা মাফিক কার্যক্রম ও নিরবচ্ছিন্ন প্রয়াস চালাচ্ছে। গজবা-ই-হিন্দ নামের কার্যক্রমে জেহাদি মুসলমান সংগঠনগুলিকে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে সমর্থন করার জন্য বেশকিছু দল সারা ভারতবর্ষ জুড়ে নিরন্তর সংগ্রাম করে চলেছে।

প্রথম দলের প্রত্যক্ষ কাজ হলো সারা ভারতবর্ষ জুড়ে দাঙ্গা লাগানো, হিন্দু বাড়িতে আগুন লাগানো, হিন্দু এলাকায় হত্যালীলা সংঘটিত করা, যানবাহনে আগুন দেওয়া-সহ বিভিন্নরকম ধ্বংসাত্বক কার্যকলাপ দ্বারা একটা সন্ত্রাসের আবহাওয়া তৈরি করা। সে কারণে প্রতিটি রাজ্যের শহরে, গ্রামে আজ তৈরি হয়ে গেছে গুপ্ত জেহাদি ফৌজ। বিভিন্ন জেহাদি সংগঠনগুলোর দ্বারা প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত জেহাদি জামাতি এ মাদ্রাসা ছাত্রদেরও এই ব্যাপারে কাজে লাগানো হয়। এছাড়াও এরা পরোক্ষভাবে আরও নানা ধরনের জেহাদ চালাচ্ছে যেগুলো হলো লাভজেহাদ, ল্যান্ডজেহাদ, এডুকেশন জেহাদ এবং বর্তমানে করোনা জেহাদ। এর জন্য মাদ্রাসা, মসজিদ এবং গ্রামে গ্রামে কাওয়ালির নাম করে নিয়মিত প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়। এই জেহাদি দলগুলোর সঙ্গে যুক্ত আইএসআই-এর সঙ্গে সম্পর্কিত মুসলমান সংগঠনগুলি যেমন--- সিমি, ইন্ডিয়ান মুজাহিদিন, ইসলামিক গার্লস স্টুডেন্টস অর্গানাইজেশন ইত্যাদি।

দ্বিতীয় দল দাঙ্গা পীড়িত এলাকায় গিয়ে আহত জেহাদি ব্যক্তিদের হাসপাতালে ভর্তি, তাদের চিকিৎসার ব্যবস্থা করা, তাদের আর্থিক সাহায্য থেকে আরম্ভ করে সমস্ত রকম আইনি সহায়তা দিয়ে থাকে যার দ্বারা গজবা-ই-হিন্দ-এর কার্যক্রম ক্রমান্বয়ে ধারবাহিক ভাবে চালু রাখা যায়। এই কার্যক্রমগুলি চালু রাখার জন্য চীন, পাকিস্তান, বাংলাদেশ এবং আরব দেশগুলি থেকে প্রচুর পরিমাণে আর্থিক অনুদান আসছে এবং নৈতিক ও ধর্মীয় সমর্থন জোগাচ্ছে কোরানের বাণী এবং কাফেরদের খতম করার বিভিন্ন হাদিশ। এরপরও পরোক্ষ সাহায্য আসছে দেশদ্রোহী, লোভী আমলা ও রাজনৈতিক নেতাদের কাছ থেকে, যারা দাগি জঙ্গিদেরও রেশন কার্ড, প্যান কার্ড, আধার কার্ড ও পাসপোর্টের সাহায্যে তাদের ভারতীয় নাগরিক বানিয়ে দিচ্ছে। তার

দিল্লির জওহরলাল নেহরু বিশ্ববিদ্যালয়ে দেশবিরোধী স্লোগানের সমর্থকদের সঙ্গে রাহুল গান্ধী। (ফাইল চিত্র)।

অকাট্য প্রমাণ বঙ্গবন্ধুর খুনি ক্যাপ্টেন মাজেদ যিনি দীর্ঘ ২২ বছর নাম ভাঁড়িয়ে কলকাতার পার্কস্ট্রিট এলাকায় কাটিয়ে দিলেন। সিএএ বিল পাশ না হলে আমরা তার হদিশও জানতে পারতাম না।

তৃতীয় দলে আছে কট্টোর হিন্দু বিরোধী এবং মুসলমান তোষণকারী বরখাদও, রাবিশ কুমার, করণ থাপার আর পুণ্য প্রসূনের মতো সাংবাদিকরা যারা নিরন্তর সংবাদপত্রে এবং টিভি চ্যানেলগুলিতে পরোক্ষভাবে জেহাদিদের সমর্থন জোগাচ্ছে এবং হিন্দুদের সেক্যুলার বানানোর জন্য নিরন্তর প্রয়াস চালাচ্ছে। পশ্চিমবঙ্গের কিছু বাজারি পত্রিকা এই কাজ করে চলেছে, সঙ্গে আছে কলমের মতো অনেক পত্রিকা। এদের একজন সম্পাদক আবার বাংলাদেশি মুসলমান যিনি পশ্চিমবঙ্গের অধুনা নিষিদ্ধ সিমির প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন।

চতুর্থ দলে আছে কপিল সিব্বাল, মনু সিংভি, সালমান খুর্সিদ, প্রশান্ত ভূষণের মতো নামজাদা আইনজ্ঞ যারা নিয়মিত জেহাদিদের আইনি সহায়তা দান করে আসছে। আফজল গুরুর জন্য রাত ১২টায় সুপ্রিমকোর্টের দরজা এরা খুলিয়াছে। নরেন্দ্র

দাঙ্গার উল্লাস (ফাইল চিত্র)

মোদীকে মারার ষড়যন্ত্রে ধরা পড়া পাঁচজন আসামির জন্য মধ্যরাত্রে এরা জামিনের ব্যবস্থা করে বিশেষ সুবিধা আদায় করে দেয়। বেশকিছু সরকারি উকিলও উৎকোচের লোভে এইসব জেহাদিদের আইনি সুবিধা পাইয়ে দিতে এগিয়ে আসেন।

পঞ্চম দলের কাজ হচ্ছে বিভিন্ন সরকারি দপ্তরে নামে বেনামে মুসলমানদের চাকরি পাইয়ে দেওয়া। এমনকী পুলিশ আইবি, সেনাবাহিনীতেও এদের লোকজন ঢুকিয়ে রেখেছে যাতে মুসলমানরা বিভিন্নরকম সরকারি সুযোগ সুবিধা পেতে পারে এবং প্রয়োজনে জেহাদিরাও এই সুযোগ কাজে লাগাতে পারে। তাই মুসলমানরা এখন দাবি করছে যে সামরিক, বেসামরিক সমস্ত বিভাগে সংখ্যা অনুপাতে তাদের কোটা দিতে হবে। এছাড়া পশ্চিমবঙ্গ-সহ বেশকিছু রাজ্য সরকারও সংখ্যালঘু তোষণের জন্য ওবিসি কোটায় মুসলমানদের বেআইনি সংরক্ষণ পাইয়ে দিচ্ছে। কয়েকবছর আগে পশ্চিমবঙ্গ

ব্যাঙ্গালুরুর দাঙ্গা (ফাইল চিত্র)

সরকার আলআমিন মিশন থেকে ব্যাপক পরিমাণে মুসলমান ছাত্র-ছাত্রীদের ডাক্তারি প্রবেশিকা পরীক্ষায় সুযোগ পাইয়ে দিয়েছে এবং সিভিক পুলিশ, প্যারাটিচার, স্থায়ী ও অস্থায়ী বিভিন্ন সরকারি পদে ব্যাপক হারে মুসলমানদের নিয়োগ করা হচ্ছে।

ষষ্ঠদলের রোমিলা থাপার, ইরফান হাবিব বা সুকুমারী ভট্টাচার্যরা ব্যস্ত থাকেন ভারতবর্ষের ইতিহাস বিকৃত করে হিন্দুদের ছোটো করার কাজে। ছত্রপতি শিবাজী, রানাপ্রতাপ, পৃথ্বীরাজ চৌহানদের ইতিহাস মুছে ফেলে আকবর, ঔরংজেব এবং খিলজি বংশের বীরত্বের কাহিনি এরা ভারতের ইতিহাসে স্থান দিয়ে তাদের মহান বানিয়েছে। তাই বর্তমান প্রজন্ম এইসব নরপিশাচ শক, হূন, পাঠান, মোগলদের নৃশংস ইতিহাস জানে না। জানে না ১৯৪৬-এর গ্রেট ক্যালকাটা কিলিং, নোয়াখালির দাঙ্গা-সহ ১৯৪৭ সালের ভারত ভাগের প্রকৃত ইতিহাস। মুম্বইয়ের বিনোদন জগৎও এরা দখল করে নিয়েছে। বিনোদন জগতে হিন্দুর ভজন, কীর্তন, পূজার ছবি মুছে ফেলার জন্য প্রযোজক গুলসন কুমারকে পর্যন্ত এরা হত্যা করেছে। তাইতো আমরা দেখি দেওয়ালিতে রিলিজ হয় সলমান খানের বই, ইদে শাহরুখ খানের বই আর বড়দিনে রিলিজ করে আমির খানের বই। হিন্দু ধর্মকে ছোটো করার জন্য বানানো হয় পিকে বা মাই গড-এর মতো তামাশা ভরা ছবি। লাভজেহাদের প্রচারের জন্য মুসলমান ছেলের সঙ্গে হিন্দু মেয়ের প্রেমকাহিনিতে ভরা ছবি বানানো হয় স্ক্রিপ্ট রাইটার প্রযোজক থেকে আরম্ভ করে বেশিরভাগ পরিচালককে এরা কবজা করে রেখেছে। দাউদ ইব্রাহিমের সময় থেকে মুম্বই ফিল্ম ইন্ডাস্ট্রি এদের দখলে এবং বর্তমানেও দাউদের এজেন্টরা সবকিছু নিয়ন্ত্রণ করছে। হিন্দুর পকেট কাটা পয়সায় নাসিরুদ্দিন সাহ এবং শাহরুখ খানের দল পাকিস্তান ও জেহাদিদের আর্থিক সাহায্য করে চলেছে। এমনকী হিন্দু অভিনেত্রীদের বিপরীতে মুসলমান অভিনেতাকে দাঁড় করানো হয় এবং তা জনপ্রিয় হয়ে গেলে হিন্দু অভিনেত্রীকে বাধ্য করা হয় মুসলমান অভিনেতাকে বিয়ে করার জন্য। আমরা দেখতে পাই বেশিরভাগ মুসলমান অভিনেতার স্ত্রী হিন্দু।

সপ্তম দলের মাথায় আছে সোরা ভাস্কর, অনুরাগ কাশ্যপ, নাসিরুদ্দিন সাহু, অরুন্ধতী রায়ের মতো লেখক, অভিনেতা-সহ বুদ্ধিজীবীরা। আখলাক হত্যা হলে বা জেহাদিদের গায়ে হাত পড়লে এরা গর্জে ওঠেন, পদক ফেরত দেবার জন্য লাইন দেন। অথচ মহারাষ্ট্রের পালঘরে হিন্দু সন্ন্যাসীদের হত্যা বা গোধরা কাণ্ডে এরা বিচলিত হন না। পশ্চিমবঙ্গেও আমরা দেখতে পাই যে, শাসকদল পোষিত বুদ্ধিজীবীরা জেহাদিদের সমর্থনে মাঝে মধ্যেই মোমবাতি হাতে নামেন। অপর্ণা সেন, সুভাপ্রসন্ন, বাদশা খান, মীরাতুন নাহার, কৌশিক সেনরা এই তালিকায় আছেন। এছাড়াও গোদের ওপর বিষ ফোঁড়ার মতো উগ্রবাদী উমর খালিদের শিষ্য কানহাইয়া কুমার বা দিল্লির জেএনইউ

এবং পশ্চিমবঙ্গের যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়কে দেশ বিরোধীদের আখড়া বানিয়ে ফেলেছে। সেখানে এরা প্রতিনিয়ত জেহাদিদের সমর্থনে প্রচার চালাচ্ছে, দাঙ্গার পরিকল্পনা করছে, বড়ো বড়ো সন্ত্রাসবাদীদের সমর্থনে মিছিল, মিটিং করছে। এই দলের প্রধান উদ্দেশ্য হলো ভারতবর্ষকে ভেঙে টুকরো টুকরো করা। এছাড়াও জামিয়ামিলিয়া বিশ্ববিদ্যালয় এবং আলিগড় বিশ্ববিদ্যালয় নিরন্তর দেশেদ্রোহিতার আগুন জ্বালিয়ে চলেছে বামপন্থীদের সমর্থনে।

অষ্টম দল পরিচালনা করেন লালুপ্রসাদ, মায়াবতী, মূলায়ম, অখিলেশ, রাহুল, প্রিয়াঙ্কা, স্ট্যালিন, কেজরিওয়াল, ইয়েচুরি, দিগ্বিজয় সিংহ, শরদ পাওয়ার ও মমতা ব্যানার্জির মতো রাজনৈতিক নেতারা। এরা ব্যস্ত থাকেন পুলিশ-প্রশাসনকে মুসলমানের আজ্ঞাবহ করে, তাদের বিভিন্ন সুযোগ সুবিধা পাইয়ে দিয়ে নিজেদের ভোটব্যাঙ্ক সুরক্ষিত করতে। নাগরিকত্ব সংশোধনী বিল নিয়ে পশ্চিমবঙ্গে মমতা ব্যানার্জি প্রকাশ্যে সংখ্যালঘু ভোটের স্বার্থে যে নোংরা খেলা খেললেন সেটা আমরা সবাই দেখলাম। অবৈধ বাংলাদেশি অনুপ্রবেশকারীরা অবাধে পশ্চিমবঙ্গে ট্রেন জ্বালিয়ে, বাস জ্বালিয়ে, সরকারি সম্পত্তি লুঠ করে কোটি কোটি টাকার ক্ষতি করে হিংসা ও সন্ত্রাসের পরিবেশ সৃষ্টি করা সত্ত্বেও দিদি তাদের কেশাগ্র পর্যন্ত স্পর্শ করার সাহস করেননি।

আমরা জানি মুসলমানরা যেখানে গেছে সেখানেই তারা অবলম্বন করে দার-উল-হারবকে দার-উল-ইসলামে পরিণত করেছে, নানা প্রকার ছলচাতুরি ও তরবারির সাহায্যে। ভাবুন তো একসঙ্গে তিন-চারজন মিলে অন্য ধর্মের একটি অসহায় মেয়েকে ধর্ষণ করেছে ও তার সামনে কোরানের বাণী পড়ে শোনাচ্ছে, আর এটাই হবে নাকি ভবিষ্যতে সারা পৃথিবীর জন্য একমাত্র ধর্ম। আজকের সিরিয়া ছিল খ্রিস্টান প্রধান অঞ্চল, ইরানে ছিল জরাথুস্ট্র ধর্ম, প্যালেস্টাইন ছিল জিউষদের, মিশর ও ইরাকে ছিল প্রাচীন ব্যাবিলনীয় সভ্যতার ধারক। আজকে এদের আর কোনো চিহ্নই খুঁজে পাওয়া যাবে না। আফগানিস্তান আটশো বছর আগেও ভারতের মধ্যে ছিল, যা ছিল গান্ধারীর জন্মভূমি। গান্ধার আজ কান্দাহার হয়েছে। পাকিস্তান ও বাংলাদেশ স্বাধীনতার আগে পর্যন্ত ভারতের অঙ্গরাজ্য ছিল। গত আটশো বছরে মধ্যযুগীয় বর্বর মুসলমান আক্রমণে কয়েক কোটি হিন্দু, শিখের প্রাণ যায় এবং প্রায় ২০০ বছরের ব্রিটিশ শাসনে কয়েক লক্ষ জীবনের বিনিময়ে আমরা স্বাধীন কিন্তু খণ্ডিত ভারতবর্ষ পেলাম। কিন্তু মহাত্মা গান্ধী ও নেহরুর ভ্রষ্টনীতির কারণে হিন্দুরা আজ নিজ দেশেই পরবাসী হতে চলেছে। ভারতবর্ষের দশটি আইন সংখ্যাগুরু হিন্দুদের ধর্মীয় ও ন্যায্য অধিকার কেড়ে নিয়েছে। একদিকে অর্থের লোভ দেখিয়ে বনবাসীদের খ্রিস্টানরা চুপিসারে ধর্মান্তরকরণ করে চলেছে, অন্যদিকে তবলিগ-ই জামাতের নেতৃত্বে জেহাদি কার্যকলাপ ও তথাকথিত সংবিধান, গণতন্ত্র ও সেক্যুলারিজমের অন্তরালে আজ ভারতের আট প্রদেশে হিন্দুরা সংখ্যালঘু হয়ে পড়েছে।

সারা পৃথিবীতে পঞ্চাশটিরও বেশি ইসলামিক দেশ এবং একশোর বেশি খ্রিস্টান দেশ রয়েছে। হিন্দুদের জন্য কোনো দেশ নেই। দেশের সরকার এখনই কার্যকরী ভূমিকা না নিলে গজওয়া হিন্দের পরিকল্পনা অনুযায়ী বিনা যুদ্ধে ভারত জয় এই সমীকরণে মুসলমান জনবিস্ফোরণ এবং অবৈধ অনুপ্রবেশ দ্বারা আগামী বিশ-ত্রিশ বছরের মধ্যে মুসলমানরা ভারতবর্ষে সংখ্যাগুরুতে পরিণত হবে। তখন ভারতবর্ষের শাসন ক্ষমতায় মুসলমানরাই থাকবে অর্থাৎ ভারতবর্ষ ইসলামিক দেশে পরিণত হবে। পৃথিবীর ইতিহাস বলছে কোনো সংখ্যালগরিষ্ঠ মুসলমান প্রধান দেশে সংখ্যালঘুরা নিরাপদ নয়।

বিগত এক দশকের চেষ্টায়. ২০১৮ সালে ইজরায়েল সংসদে ইজরাইলকে ইহুদিরাষ্ট্র বানানোর জন্য বিল আনা এনেছিল এবং সংখ্যাগরিষ্ঠ সদস্যদের ভোটে সেই বিল পাশ হয়ে আজকে ইজরায়েল স্বাধীন ইহুদিরাষ্ট্র হিসেবে সারা বিশ্বের কাছে আত্মপ্রকাশ করেছে। আমরা এও জানি যে, ইহুদিরা ইসলামিক আক্রমণের শিকার হয়ে হাজার হাজার বছর পালিয়ে বেঁচেছিল। কিন্তু তাদের অসীম সাহস, ধৈর্য, মেধা সংকল্প ও সাহসিকতার জন্য তারা একতাবদ্ধ হয়ে পুনরায় ইসলামিক আক্রমণ থেকে ইজরায়েলকে উদ্ধার করে আজকে পৃথিবীর অন্যতম শক্তিশালী রাষ্ট্রে পরিণত করেছে। যা ইসলামিক জেহাদিদের কাছে এক ত্রাস হয়ে দাঁড়িয়েছে। হাজার হাজার বছরের প্রাচীন ভারতীয় সভ্যতাকে রক্ষা করতে হলে ইজরায়েলের পথ অবলম্বন করে ভারতবর্ষকে অবিলম্বে শক্তিশালী হতেই হবে। এর জন্য হিন্দু সমাজকে একতাবদ্ধ হতে হবে, বিভিন্ন হিন্দু সংগঠনকে দায়িত্ব নিয়ে হিন্দু অস্তিত্ব রক্ষার দাবি বর্তমান জাতীয়তাবাদী সরকার তথা প্রধানমন্ত্রী ও রাষ্ট্রপতির কাছে পৌঁছে দিতে হবে। ■

আসন্ন বিহার নির্বাচনে এনডিএ-র জয় সুনিশ্চিত করার সঙ্গে সংক্রমণ বৃদ্ধি আটাকানো জরুরি

চাণক্য

নির্বাচন কমিশন ইতিমধ্যেই বিহার বিধানসভা নির্বাচনের নির্ঘণ্ট ঘোষণা করেছে। ভোটের দিন, সময়, নির্বাচন বুথের সংখ্যার সঙ্গে ভোটের ময়দানেও যাতে কোভিড নিরাপত্তা জারি রাখতে সামাজিক দূরত্ব বজায় রাখা হয় সে বিষয়ে তারা অতিরিক্ত সতর্কতার কথা শুনিয়েছে। বিশেষ করে ভোট প্রচার ও ভোট প্রক্রিয়া চলাকালীন সরকারের তরফে সব ধরনের সাবধানতা পালনে জোর দেওয়ার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। এমন নির্বাচনের প্রাক্কালে এগুলি যথাযথ পালন করা হবে নাকি নির্বাচনজনিত কারণে রাজ্যে সংক্রমণ আরও ছড়িয়ে পড়বে তা জানতে আমাদের নভেম্বরের প্রথম সপ্তাহ অবধি অপেক্ষা করতে হবে।

নির্বাচন কমিশনের ঘোষণা অনুযায়ী বিহারে অক্টোবরের ২৮ থেকে নভেম্বরের ৭ পর্যন্ত তিন দফায় নির্বাচন হবে। সারা বিশ্বের মধ্যে করোনা ভাইরাসের আক্রমণের পর এটিই হবে সর্ব বৃহৎ নির্বাচন। প্রচার প্রক্রিয়া ও পদ্ধতির ওপর কমিশন যে লাগাম টেনেছে তার প্রভাব নিশ্চিত ভাবে প্রার্থীদের প্রচারে ও নির্বাচনী প্রক্রিয়ার ওপর পড়বে। কিন্তু কেবলমাত্র করোনা ভাইরাসজনিত সংক্রমণই এই বিধানসভা নির্বাচনে একমাত্র নির্ণায়ক ফ্যাক্টর এটা ভাবা ঠিক নয়। আরও চার চারটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় আছে যা বিহার নির্বাচনের ফলাফলকে প্রভাবিত করতে পারে।

প্রথমেই বলতে হবে ২০২০-র নির্বাচন ২০১৫ সালের নির্বাচন থেকে মূলগতভাবে আলাদা ও তুলনামূলক ভাবে কম প্রতিদ্বন্দ্বিতামূলক। ২০১৫ সালের নির্বাচনের সময় বিহারের রাজনৈতিক পরিস্থিতি আর আজকের অবস্থায় আকাশ-পাতাল তফাত। সে সময় লালুপ্রসাদ যাদব ও নীতীশকুমার নামের যে দুই ব্যক্তিত্ব ১৯৯০-এর দশক থেকে বিহার রাজনীতিকে নিয়ন্ত্রণ করছিলেন তাঁরা পারস্পরিক বিবাদ ভুলে হাত মিলিয়ে নেন। জোটবদ্ধ হয়ে বিজেপি-র বিরুদ্ধে ভোট লড়েন। এই নবগঠিত জোট নতুন জাতপাতের সমীকরণ

অতিথি কলম

তৈরি করে বিজেপি-কে বিরাট পরাজয়ের মুখ দেখায়। কিন্তু এই জোট জন্মসূত্রেই অলপকা ছিল। বছর দেড়েকের মধ্যেই ২০১৭ সালে নীতীশকুমার পুরনো এনডিএ জোটে ফিরে আসেন।

২০১৯ সালের লোকসভা নির্বাচনে এনডিএ জোট লোকসভা নির্বাচনে নিরঙ্কুশ

> **অন্যান্য রাজ্যের তুলনায় বিহারের স্বাস্থ্য পরিকাঠামো অত্যন্ত হতাশব্যঞ্জক। যার ফলে সংক্রমণ মোকাবিলায় রাজ্যকে ভুগতে হচ্ছে। এরই সুযোগ নিয়ে বিরোধীরা বর্তমান নির্বাচনকে বাতিল করে দেওয়ার দাবি পর্যন্ত জানিয়েছিল।**

প্রাধান্য দেখিয়ে আরজেডি-র মহাগঠবন্ধনকে তছনছ করে দেয়। আরজেডি-র লোকসভায় কোনো সাংসদ পৌঁছয় না। আজকের তারিখে দুর্নীতিতে সাজাপ্রাপ্ত লালুপ্রসাদ রাঁচিতে জেলবন্দি। প্রায়শই জামিনের ব্যর্থ আবেদন করছেন। এখন সর্বশেষ ফলাফল হিসেবে ২০১৯-এর লোকসভাকে ধরলে লালুর ছেলেরা তাঁর দলকে নির্বাচনী প্রতিদ্বন্দ্বিতার আসরে তুলে আনতে নিতান্তই ব্যর্থ হয়েছে। লালুর রাজনৈতিক দূরদর্শিতা ও জনমোহিনী আকর্ষণের ছিটেফোঁটাও তাদের মধ্যে নেই। সেই কারণে ২০১৫-তে যে ফলাফল হয়েছিল ২০২০ সালে এনডিএ-র তেমন হতাশাগ্রস্ত ফলাফল হওয়ার সম্ভাবনা নিতান্তই নগণ্য।

কিন্তু বিহার এনডিএ-র মধ্যে অভ্যন্তরীণ টেনশনের ফল্গুধারা বয়েই চলেছে। নীতীশকুমারের জনতা দল (ইউনাইটেড) ১৬টি লোকসভা আসন নিয়ে এনডিএ-তে দ্বিতীয় বৃহত্তম দল। কিন্তু আশ্চর্যের কথা কেন্দ্রীয় মন্ত্রীসভায় তাদের একজনও মন্ত্রী নেই। মন্ত্রীসভা গঠনের সময় দল ২ জন পূর্ণ ক্যাবিনেট মন্ত্রী দাবি করলেও তাদের ১টি দেওয়ার প্রস্তাব করা হয়। এর পূর্ব ইতিহাস হচ্ছে লোকসভা নির্বাচনের আসন ভাগাভাগির সময় বিজেপি তাদের নির্বাচিত বেশ কিছু সাংসদকে বঞ্চিত করে জনতা দলের সঙ্গে সমানুপাতে ১৭-১৭ ও লোক জন শক্তি পার্টি ৬ হিসেবে আসন বাঁটোয়ারা করে। তবে ২০১৫ সালের আগের অধিকাংশ নির্বাচনেই বিহার বিধান সভায় অনেক বেশি আসনে লড়ত জেডিইউ। অন্যদিকে এলজেপি এই প্রথম এনডিএ শরিক হয়ে বিহার বিধানসভায় লড়ছে। তাই তিন শরিকের মধ্যে আসন বণ্টনের দিকে সকলের নজর রয়েছে। তাৎপর্যপূর্ণভাবে

২০১৯-এর লোকসভা নির্বাচনের পর মহারাষ্ট্র ও ঝাড়খণ্ড বিধানসভা নির্বাচন দুটিতে বিজেপি শরিক দলগুলির সঙ্গে আসন বণ্টন ও অন্যান্য সমস্যা মেটাতে ব্যর্থ হয়। এর পরিণতিতে দুটি রাজ্যই তাদের হাতছাড়া হয়। বিরোধীরা যথেষ্ট জোর পায়। স্মরণে থাকবে ঝাড়খণ্ডের ক্ষেত্রে ভোটের আগেই 'অল ঝাড়খণ্ড সুডেন্টস ইউনিয়ন' আসন বণ্টন মনঃপুত না হওয়ায় জোট ছেড়ে বেরিয়ে যায়। যার ফল হয় বহু আসনে বিজেপি-র অত্যন্ত কম ভোটে হার। অন্যদিকে মহারাষ্ট্রে ভোট ফলাফল ঘোষিত হওয়ার পর বিজেপি সর্ব বৃহৎ দল হিসেবে শিবসেনার সঙ্গে জোটে জিতে এলেও অনেক আলোচনা পরামর্শের পর শিব সেনা জোট ভেঙে দেয়। এই পরিপ্রেক্ষিতে এনডিএ-র শরিকদের নিয়ে জোটের সামগ্রিক অবস্থানের মূল্যায়ন বিহারের এই নির্বাচন অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

বিহারের মুসলমানরা কী ভাবছেন? তাঁরা কোনদিকে যাবেন। মাথায় রাখতে হবে নীতীশকুমার ২০০৫ ও ২০১০-এর নির্বাচনে এনডিএ জোটের সঙ্গী হয়ে লড়েও পর্যাপ্ত মুসলমান ভোট পেয়েছিলেন। এই একই কারণে নরেন্দ্র মোদীর প্রধানমন্ত্রী পদপ্রার্থী হওয়া নিয়ে তিনি জোট ছেড়ে বেরিয়ে যান। আশঙ্কা ছিল মুসলমান ভোটের নিশ্চয়তা নিয়ে। এই নির্বাচনে মুসলমান ভোটের কিছু অংশ আবার জেডিইউ ও এনডিএ-তে ফিরে আসবে কি? (লোকসভার ফল বিচার না করে)। আসার সম্ভাবনাই বেশি, কেননা মুসলমান ভোটের আশ্রয় লালুর দল এমন তীব্র সমস্যার মধ্যে দিয়ে চলেছে।

একটা জিনিস দেখার যে, নীতীশকুমার ভোটের বিভিন্ন প্রচার সভায় বিজেপি-র মুসলমান সংক্রান্ত বক্তব্যগুলিকে কতটা বাগে রাখতে পারবেন। অন্যদিকে নীতীশের নির্দেশিত নরম পথ অবলম্বন করলে বিজেপি-র কেন্দ্রীয় হিন্দুত্ব বিষয়টির ওপর অবিচার করা হবে বা অবহেলিত থেকে যাবে। আরও একটি নতুন জিনিস মাথাচাড়া দিয়েছে আসাদুদ্দিন ওয়েসির এআইএমআইএম নামের সম্পূর্ণ সাম্প্রদায়িক মুসলমান দল। এরা উত্তর-পূর্ব বিহারের মুসলমান অধ্যুষিত একটি অঞ্চলের উপনির্বাচনে ইতিমধ্যেই জিতেছে। এদের ভোট বাড়ার অর্থই আরজেডি-র ভোট ক্ষয়। করোনার পরের অর্থনৈতিক যন্ত্রণার পরিণতি কি অ্যান্টি ইনকামবেন্সি হিসেবে প্রতিফলিত হবে? অন্যান্য রাজ্যের তুলনায় বিহারের স্বাস্থ্যপরিকাঠামো অত্যন্ত হতাশব্যঞ্জক। যার ফলে সংক্রমণ মোকাবিলায় রাজ্যকে ভুগতে হচ্ছে। এরই সুযোগ নিয়ে বিরোধীরা বর্তমান নির্বাচনকে বাতিল করে দেওয়ার দাবি পর্যন্ত জানিয়েছিল।

অন্যদিকে দেশের অন্যান্য রাজ্য থেকে ব্যাপক সংখ্যক বিহারি শ্রমিকের টাকা পাঠানো বন্ধ হয়ে যাওয়ায় রাজ্য অর্থনীতির ওপর চাপ ফেলেছে। ২০১৮ সালে বিশ্বব্যাঙ্কের তরফে তৈরি করা একটি সমীক্ষায় দেখা যায় বিহারের মোট রাজ্য জিডিপি-র ৩৫ শতাংশ ভিন রাজ্য বা দেশের কর্মরত পরিযায়ী শ্রমিকদের পাঠানো টাকায় বহু পরিবারের খরচ খরচায় টান পড়েছে। নেমেছে এসজিডিপি। অবশ্য কেন্দ্রীয় সরকারের তরফে নির্বাচনের প্রাক্কালে বহু রাজ্যের মতো বহু উন্নয়নমূলক প্রকল্প চালু করার কথা ঘোষণা হলেও পরিস্থিতির মোড় ঘুরিয়ে দেওয়ার মতো তেমন কিছু নেই। এই নেতিবাচক বিন্দুগুলি শাসকের বিরুদ্ধে কাজ করবে? আরও একটি বিষয় ভোটদাতারা কেমন সংখ্যায় বেরোবে। নির্বাচন কমিশন নির্দেশাবলী দিয়েছে। তা অগ্রাহ্য করলে সংক্রমণ বাড়বে। মানুষ এটিকে কীভাবে নেবে? আতঙ্কিত মানুষজন যদি গৃহাবদ্ধ হয়ে ভোটদানে অনীহা দেখান তার পরিণতি অজানা। তবে নিশ্চিতভাবে বলা যায় এই 'করোনা-১৯' সমাজের মধ্যে দুটি প্রত্যক্ষ শ্রেণীবিভাগ করে দিয়েছে। এক দল রয়েছে যারা নিজেদের নিরাপদ রাখতে বাইরে বেরুতে অনিচ্ছুক। আর এক দল যারা এই অতিমারী নিয়ে বিন্দুমাত্র চিন্তিত নয়। এই ঘরে থাকার বিষয়টিও যে শ্রেণীর কাজ ঘরে বসেও (work from home) করা যায় বা যাদের হাতে পর্যাপ্ত অর্থ আছে জীবিকার সন্ধানে না বেরোলেও চলবে তারা এই নির্বাচন কমিশন ও সরকার ঘোষিত সামাজিক দূরত্ব বজায় রাখতে পারবে। বিহারের উল্লেখিত অভিজাত শ্রেণীর গরিষ্ঠাংশই এনডিএ-র সমর্থক। আর এই শ্রেণীর নিজের নিরাপত্তা সম্পর্কে অতি সচেতন মানুষজন ভোটাধিকার প্রয়োগ করতে না বেরোলে কিন্তু এনডিএ জোটের ক্ষতির সম্ভাবনা। ▮

ভারত সেবাশ্রম সঙ্ঘের মুখপত্র

প্রণব

পড়ুন ও পড়ান

শোক সংবাদ

মালদা জেলার কলিগ্রাম শাখার স্বয়ংসেবক এবং ভারতীয় জনতা পার্টির দীর্ঘদিনের কর্মী অশেষকৃষ্ণ গোস্বামী গত ২ অক্টোবর পরলোকগমন করেন। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৭০ বছর। রেখে গেছেন দাদা সুভাষকৃষ্ণ গোস্বামী, বউদি, দিদি-জামাইবাবু, ২ বোন । শিশুকাল থেকে স্বয়ংসেবক। মালদা কলেজে পড়াকালীন সঙ্ঘের মালদা নগরের দায়িত্ব পালন করেন। রাজনৈতিক দায়িত্ব হিসেবে জনসঙ্ঘ, পরে ভারতীয় জনতা পার্টির মালদা জেলা সংগঠন সম্পাদকের দায়িত্ব নির্বাহ করেন। ১৯৭৫ সালে জরুরি অবস্থার প্রতিবাদে সত্যাগ্রহ করে কারাবরণ করেন।

কলিগ্রাম সরস্বতী শিশু মন্দিরের প্রতিষ্ঠা তাঁর একার কৃতিত্বেই হয়েছে। গ্রামের বহু মানুষের কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করেছেন।

বিশেষ নিবন্ধ

কমিউনিস্ট চীনের স্বরূপ ধীরে ধীরে উন্মোচিত হচ্ছে

চীন গরিব দেশগুলোকে ঋণের জালে জর্জরিত করে এমনকী ঋণগ্রস্ত দেশের ভূমি পর্যন্ত নিয়ে নিচ্ছে। শ্রীলঙ্কার হাম্বান টোটা বন্দর ৯৯ বছর লিজে দখল নেওয়া তারই উদাহরণ। এভাবে আফ্রিকান দেশ জিবুতিতে গড়ে তুলেছে সামরিক ঘাঁটি। সম্প্রতি শ্রীলঙ্কার নতুন সরকারের পররাষ্ট্রমন্ত্রী প্রকাশ্যেই বলেছেন হাম্বান টোটা বন্দর চীনের কাছে ইজারা দেওয়া ছিল একটি ভুল সিদ্ধান্ত'।

শেষ পর্ব

ঢাকা থেকে বিশেষ প্রতিনিধি ।।

কমিউনিস্ট চীন সাম্পতিক সময়ে বিশ্বব্যাপী শীর্ষ আগ্রাসী শক্তি হিসেবে নিজেদের প্রতিষ্ঠি করেছে। তবে তাদের আগ্রাসনে অর্থনীতিকে অনুসরণ করে সামরিক শক্তি। তাদের আরেক রণাঙ্গন জীবাণুযুদ্ধ। কোভিড-১৯ সংক্রমণ ঘটিয়ে বিশ্বব্যাপী বিপর্যয় সৃষ্টির সর্বশেষ নজির। এর মধ্যে কোভিড-১৯-এ মৃত্যুর সংখ্যা ১০ লক্ষ পেরিয়ে গেছে। ১৮৮ টি দেশে এই মহামারী ছড়িয়েছে। আক্রান্ত ৩ কোটি ২০ লক্ষের মতো। এই জীবাণুযুদ্ধের পরিকল্পনা চীনের দীর্ঘদিনের। সম্প্রতি ঘোষণা করা হয়েছে পাকিস্তানে জীবাণু নিয়ে একটি গবেষণাগার স্থাপন করবে চীন, যার জন্য ১ বিলিয়ন ডলার বরাদ্দ করা হয়েছে। প্রাথমিক লক্ষ্য ভারত তো বটেই।

চীনের জীবাণু বিশেষজ্ঞ লি মেং ইয়ান দাবি করেছেন, করোনা ভাইরাস চীনের হুবেই প্রদেশের উহান শহরের বাজার থেকে ছড়ায়নি। করোনা ভাইরাস তৈরি করা হয়েছে চীনের গবেষণাগারে। করোনা যে মানুষের সৃষ্টি সে বিষয়ে তাঁর কাছে বৈজ্ঞানিক প্রমাণ আছে। তিনি সেটি প্রকাশ করবেন।

যদিও সারা বিশ্বের বিজ্ঞানীরা এ বিষয়ে একমত হয়েছেন যে, করোনা ভাইরাস প্রকৃতিগত ভাবেই সৃষ্টি হয় এবং বাদুড় কিংবা এ জাতীয় প্রাণী থেকে সংক্রমিত হয়েছে। তবে হংকং থেকে পালিয়ে যুক্তরাষ্ট্রে যাওয়া লিং মেং ইয়ান বলেন, আমি প্রমাণ হাজির করবো মানুষকে এটা বলার জন্য যে, করোনা চীনের গবেষণাগার থেকে এসেছে। চীন থেকেই এই ভাইরাস তৈরি করা হয়েছে।

চীনের মূল ভূখণ্ড থেকে করোনা ভাইরাস ছড়িয়ে পড়ার মতো খবর পাওয়ার পর গত বছরের ডিসেম্বরে সে ব্যাপারে তদন্তের দায়িত্ব পান তিনি। হংকংয়ে কর্মরত ওই জীবাণু বিশেষজ্ঞ দাবি করেন, জনগণের সামনে ঘাষণা করার আগে থেকেই করোনা সংক্রমণের ব্যাপারে জানতো চীন সরকার।

এর মধ্যে নিজের সুরক্ষাজনিত উদ্বেগের কারণে গত এপ্রিলে যুক্তরাষ্ট্রে চলে যান লিং মেং ইয়ান। গত ১১ সেপ্টেম্বর যুক্তরাষ্ট্রের একটি গোপন জায়গা থেকে ব্রিটিশ টক শো'র সাক্ষাৎকারে বলেন, 'হংকং স্কুল অব পাবলিক হেলথ্'-এর ভাইরোলজি অ্যান্ড ইমিউনোলজি বিশেষজ্ঞ হিসেবে তিনি করোনা নিয়ে গবেষণা করেন। সেই গবেষণার ফল নিজের উর্ধ্বতন কর্মকর্তাকে দিয়েছিলেন। কিন্তু উলটে তাঁকে চুপ থাকতে বলা হয়। না হলে গায়েব করে দেওয়া হবে বলেও হুমকি দেওয়া হয়। বিশেষজ্ঞরা অবশ্য এখন অনুধাবন করছেন, ইউরোপ-আমেরিকা যেখানে করোনা নিয়ন্ত্রণে হিমশিম খাচ্ছে, সেখানে চীনে মৃত্যুর সংখ্যা পাঁচহাজার পেরোল না, রাজধানী বেজিং সহ বড়ো বড়ো শহরে ছড়ালো না, দ্রুত টিকা আবিষ্কারের ঘোষণা দেওয়া হলো -- বিষয়গুলো একটু অস্বাভাবিক নয় কি? টিকা নিয়ে রাজনীতির সূচনাও চীনের।

এবার যুদ্ধের বিষয়ে আসা যাক। চীন সর্বশেষ যে যুদ্ধ করেছিল তা ছিল ১৯৮৯ সালের ভিয়েতনামে এবং সেটা সেটা ছিল নিষ্ফলা আগ্রাসন। এই যুদ্ধের পর চীন প্রচার করতে শুরু করে যে তারা কখনো বিদেশের এক ইঞ্চি মাটিও দখল করতে পছন্দ করে না। ভিয়েতনামকে শিক্ষা দিতে গিয়ে সেই যুদ্ধে চীনাবাহিনী উলটো বিপাকে পড়ে দ্রুত সেনা প্রত্যাহার করে নেয়। এর পর চীন আর কোনো যুদ্ধে জড়ায়নি।

ইয়াহু নিউজ জানাচ্ছে, অবশ্যই ১৯৮৯ সালের তুলনায় বর্তমানে পিপলস্ লিবারেশন আর্মি (পিএলএ) একেবারেই

আলাদা। বিশ্বের দ্বিতীয় বৃহত্তম প্রতিরক্ষা বাজেট এখন চীনা সেনাবাহিনীর। এছাড়া কন্টিনেন্টাল মিলিটারি থেকে পিএলএ এখন মেরিটাইম মিলিটারিতে পরিণত হওয়ায় শক্তি-সামর্থ্য এবং সামরিক সরঞ্জামে অনেক সমৃদ্ধ হয়েছে। তবে পিএলএ-এর যুদ্ধক্ষেত্রের কার্যকারিতা নিয়ে এশিয়া ও বিশ্বের অন্যান্যদের মাঝে গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন রয়ে গেছে। বিশেষত বেইজিং যেভাবে পিএলকে প্রদর্শন করে এবং বিশ্বকে প্রচ্ছন্ন হুমকি দেয় সেটার সক্ষমতা নিয়ে।

মার্কিন পররাষ্ট্র দপ্তরের পূর্ব এশিয়া ও প্রশান্ত মহাসাগরীয় বিষয়ক ব্যুরোর সহকারী সচিব ডেভিড স্টিলওয়েল ১৭ সেপ্টেম্বর বলেছেন, আজ আমরা চাইনিজ কমিউনিস্ট পার্টির (সিসিপি) সঙ্গে যেমন জড়িত রয়েছি তেমনই চীনা সেনাবাহিনীর সঙ্গেও কাজ করছি। তবে যেভাবে নিজেকে উপস্থাপন করে, বাস্তবে আমরা তেমনটি দেখি না। সিসিপি এখন বিশ্বজুড়ে, বিশেষত ইন্দো-প্রশান্ত মহাসাগরীয় অঞ্চলে আন্তর্জাতিক নিয়মনীতি উপেক্ষা করে নিজস্ব ক্ষমতার বলয় সৃষ্টি করতে চায় যেটা বিশ্ব সম্প্রদায়কে প্রভাবিত করবে।

স্টিওয়েল হুঁশিয়ারি উচ্চারণ করে বলেন, বিগত কয়েক মাসে বিশ্বব্যাপী আগ্রাসন শুরু করেছে চীন। বিশেষত ভারতীয় সীমান্তে চীনা হিংস্র আগ্রাসন, দক্ষিণ চীন সাগরে ব্যালাস্টিক ক্ষেপাণাস্ত্র ছোঁড়া, দক্ষিণ চীন সাগরের দাবিদার দেশগুলোর সঙ্গে নিকৃষ্ট পর্যায়ের বর্বরতা, তাইওয়ানের বিরুদ্ধে তীব্র মৌখিক ও সামরিক হুমকি এবং জাপান নিয়ন্ত্রিত সেনকাকু দ্বীপপুঞ্জে নৌবহর প্রেরণ। সর্বশেষ বার্বডোজকে ঋণের ফাঁদে ফেলেছে। এগুলো কোনো দায়ত্বশীল বৈশ্বিক নেতার কাজ নয়, বরং আইনকে তোযাক্কা না করে এক বোকার কাজ। আরও বিস্তৃতভাবে বলা হয়, কোভিড-১৯-এর সুযোগ নিয়ে বছরের গোড়া থেকেই চীন তাইওয়ান প্রণালী, দক্ষিণ চীন সাগর ও পূর্ব চীন সাগরে বার বার যুদ্ধবিমান ও রণতরী পাঠিয়েছে। তিব্বত থেকে তাইওয়ান প্রণালী পর্যন্ত সামরিক মহড়া শুরু করেছে। তারা এক রকম যুদ্ধাবস্থা তৈরি করেছে। সামরিক মহড়ার সময় ভারত, তাইওয়ান, জাপান ও দক্ষিণ চীন সাগরের অন্যান্য দেশের সীমানা লঙ্ঘন করেছে চীন। আর এটা করেছে নিজেদের শক্তি প্রদর্শন করতে। একটা চীনা যুদ্ধবিমান তাইওয়ানের সীমানা লঙ্ঘন করে সেদেশে ঢুকে পড়লে তারা গুলি করে সেটাকে ভূপাতিত করে। এটা চীনের জন্য তাইওয়ানে একটা বার্তাও বটে। প্রতিবেশী দেশগুলোর সঙ্গে চীনের সম্পর্কের যেভাবে অবনতি ঘটছে তা গোটা এলাকায় উত্তেজনা উসকে দিচ্ছে। চলতি বছরের মে মাসে চীনা সৈন্য লাদাখের প্রকৃত সীমা লঙ্ঘন করে। এরপর থেকে ভারত ও চীনের মধ্যে সীমান্ত বিরোধ চলে আসছে। এর জের ধরে ১৫ জুন দুদেশের সেনার মধ্যে সংঘর্ষের ঘটানায় উভয় পক্ষের সেনাই হতাহত হয়। এ ঘটনায় ভারত তাদের পক্ষে নিহত ও আহতের বিষয়টি নিশ্চিত করলেও চীন হতাহতের বিষয়ে কোনো মন্তব্য করেনি।

পিএলএ-এর যুদ্ধের কার্যকারিতা যাচাই করেছেন এমন একজন বিশেষজ্ঞ হলেন অস্ট্রেলিয়ার ম্যাককুরিয়ে বিশ্ববিদ্যালয়ের নিরাপত্তা অধ্যয়ন ও অপরাধ বিভাগের অধ্যাপক ড. বেটিস গিল। চলতি বছরে তিনি রয়েল ইউনাইটেড সার্ভিসেস ইনস্টিটিউটের জন্য একটি সিদ্ধান্ত প্রস্তাবনা দিয়েছেন। সেখানে চীনা বাহিনীর কার্যকারিতা সম্পর্কে বয়ান রয়েছে। গিল বিশ্বাস করেন যে, চীনা সেনাবাহিনীতে বর্তমান ২০ লক্ষ সক্রিয় সদস্য রয়েছে। যার মধ্যে গ্রাউন্ড ফোর্স মাত্র ৫০ শতাংশ, পিএলএ নেভি (পিএলএএন) এবং মেরিন কর্পস প্রায় ১২.৫ শতাংশ, পিএলএ এয়ার ফোর্স (পিএলএএফ) ২০ শতাংশের কাছাকছি, পিএলএ রকেট ফোর্স (পিএলএআরএফ) ৬ শতাংশ, পিএলএ স্ট্যাটেজিক সাপোর্ট ফোর্স (পিএলএসএফ) ৯ শতাংশ এবং বাকি ৪ শতাংশ যৌথ লজিস্টিক সাপোর্ট ফোর্স। এছাড়াও প্রায় ৫ লক্ষ রিজার্ভ ফোর্স রয়েছে। এদের মধ্যে ৪লক্ষ চুক্তিবদ্ধ নাগরিক। পিপলস্ আর্মড পুলিশের (চীনা কোস্ট গার্ড সহ) প্রায় ৫ লক্ষ সদস্য রয়েছে। সব মিলিয়ে চীন ৩০ লক্ষের বেশি সশস্ত্র কর্মী দেখাতে পারবে না।

বিভিন্ন সূত্র উদ্ধৃত করে আন্তর্জাতিক গণমাধ্যমে বলা হচ্ছে, বর্তমানে চীনের কমিউনিস্ট পার্টি বিভিন্ন ইস্যুতে অভ্যন্তরীণ ও আন্তর্জাতিক চাপের মধ্যে রয়েছে। তাই দেশের সাধারণ মানুষের মনোযোগ অন্যদিকে ফেরাতে তারা যুদ্ধ যুদ্ধ উত্তেজনা সৃষ্টি করছে। আর এটা মনোযোগ অন্যদিকে ধাবিত করার জন্য বেশ কার্যকর। যাই হোক, চীনের কমিউনিস্ট পার্টি তাদের সেনাবাহিনীকে যুদ্ধের প্রান্তে ঠেলে দিকে প্রস্তুত কিনা সেটি এখনো স্পষ্ট নয়। গণমাধ্যমে আরও এসেছে, পিএলএ সদস্যরা ভারত সীমান্তে যাওয়ার নির্দেশ পেলেই হতাশায় ভেঙে পড়ে। তাইওয়ানের একটি সংবাদপত্র সীমান্তগামী সেনাভর্তি একটি বাসের ছবি প্রকাশ করেছ, তাতে দেখা যাচ্ছে, সেনারা কান্নাকাটি করছে। বিষাদে সবাই আচ্ছন্ন। বিশেষ করে লাদাখের গালোয়ানে সংঘর্ষের ঘটনা চীনা সেনাদের মধ্যে হতাশা সৃষ্টি করেছে। এই সংঘর্ষে ২০ জন ভারতীয় সেনা নিহত হন, যাঁদের রাষ্ট্রীয় মর্যাদায় শেষ বিদায় জানানো হয়। অপরদিকে চীনা কর্তৃপক্ষ তাদের পক্ষে হতাহতের সংখ্যা গোপন করে। অর্থাৎ নিহতরা রাষ্ট্রীয় সম্মান পর্যন্ত পায়নি। আন্তর্জাতিক গণমাধ্যমে এই সংঘর্ষে চীনের পক্ষে প্রচুর হতাহতের কথা বলা হয়েছে।

চীনের কমিউনিস্ট পার্টির কূটনীতি, বিশেষত হংকংয়ে জাতীয় সুরক্ষা আইন পাশ পশ্চিমি বিশ্বকে ক্ষুব্ধ করেছে। একই সঙ্গে আমেরিকার নেতৃত্বে একটি বৈশ্বিক জোট তৈরি করেছে। চীন আন্তর্জাতিক অঙ্গনে একঘরে হয়ে পড়েছে। ভারতের সঙ্গে সংঘাত বাধিয়ে চীন যে লাভবান হয়নি এটা চীনা কমিউনিস্ট পার্টির শীর্ষ নেতাদের বেশ কয়েকজনের মনোভাবে প্রতিফলিত হয়েছে বলে কঠোর নিয়ন্ত্রণ সত্ত্বেও ফাঁকফোকর গলে গণমাধ্যমে বেরিয়ে আসছে। ভারতকে চারিদিকে ঘিরে ফেলার চেষ্টাও সেভাবে সফল হচ্ছে না। এই প্রেক্ষাপটে চীনের কমিউনিস্ট পার্টির শীর্ষনেতৃত্বের একটা বড়ো অংশে অসন্তোষ তৈরি হয়েছে। পশ্চিমি গণমাধ্যমে আরও খবর বেরিয়েছে, চীনা সেনাবাহিনী মনে করছে, ভারতের সঙ্গে

যুদ্ধে তাদের লাভ হবে না, ভারতের শক্তিকে খাটো করে দেখার সুযোগ নেই। তাদের এই মনোভাব নাকি তাদের প্রধানমন্ত্রীকে জানানো হয়েছে। এ মাসের গোড়ার দিকে চীনা কমিউনিস্ট পার্টির প্রতিরক্ষা সংক্রান্ত কমিটিতে বিষয়টি নিয়ে নাকি আলোচনাও হয়েছে।

কিন্তু যতদূর জানা যায়, সমস্যা হচ্ছে পার্টির প্রেসিডেন্ট ও চেয়ারম্যান শি জিন পিং-এর অবস্থান নিয়ে। তিনি প্রায় একক ভাবেই বিশ্বজুড়ে সংঘাতের যে রাস্তা তৈরি করেছেন, আগ্রাসনের মাধ্যমে বিশ্বের এক নম্বর শক্তি হওয়া স্বপ্ন দেখছেন, তা অনেকটা বাঘের পিঠে চড়ে বসার মতো। আন্তর্জাতিক বিশ্লেষকদের সঙ্গে ঢাকার কূটনৈতিক বিশ্লেষকরাও একমত যে, লাদাখ ও অরুণাচলে, দক্ষিণ চীন সাগরে, তাইওয়ানে অন্য ইতিহাস রচিত হলে শি জিন পিং-কে পার্টির পরবর্তী কংগ্রেসের আগেই সরে দাঁড়াতে হবে। ওয়ান বেল্ট ওয়ান রোড নিয়ে পরবর্তী নেতারাই সিদ্ধান্ত নেবেন। ভারতের চারপাশের প্রতিবেশীদের নতুন হিসেবনিকেশের সুযোগ করে দেবে। আর তিব্বত? আগ্নেয়গিরির উদ্গীরণ শুরু হওয়ার ক্ষেত্র তো প্রস্তুত হয়েই আছে। সারা বিশ্বে ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা তিব্বতীয়রা এখন তাদের অস্তিত্ব জানান দিচ্ছে, বিক্ষোভ করছে।

জুনের মাঝামাঝি সময়ে গালোয়ান সংঘর্ষ চীনের কমিউনিস্ট পার্টি (সিসিপি) ও পিপলস্ আর্মিকে স্মরণ করিয়ে দিয়েছে যে, যে কোনো স্থানীয় দ্বন্দ্ব সবসময় একতরফা হয় না। একই সঙ্গে এতে উভয় পক্ষের জানমালের ক্ষয়ক্ষতি হয়। সিসিপি এবং পিএলএ এখনো হতাহতদের পরিবারের মোকাবেলায় প্রস্তুত নয়। চীনের জন্য চরম ত্যাগ স্বীকার করা সেনাবাহিনীর উল্লেখযোগ্য সংখ্যক সেনা এখনো নিখোঁজ রয়েছে। আর এটি সে দেশে সাধারণ মানুষের মধ্যে নেতিবাচক ধারণা তৈরি করেছে। শি-র পায়ে নীচ থেকে মাটি সরছে কি? □

ভারতীয় শিক্ষার স্বরূপ

ধর্মপুরুষার্থ ও শিক্ষা

ইন্দুমতী কাটদরে

বর্ণধর্ম :

সমাজে সবাই মিলেমিশে সৌহার্দ্যপূর্ণভাবে থাকতে হয়। সবার জন্য সুখ, সমৃদ্ধি, শান্তি, সংস্কার সুলভ হোক এভাবে থাকতে হয়। এ কারণেই আমাদের মনীষীরা বর্ণ ব্যবস্থার বিধান দিয়েছিলেন। আজ এই ব্যবস্থার বিপর্যয় হয়ে অত্যন্ত বিকৃত হয়ে গেছে ঠিক কিন্তু মূলত তা যে তেমনটা নয় এও ঠিক। মূলত এটা সমাজকে ধরে রাখার মতো এবং মানুষের অর্থ ও কামের প্রবৃত্তিকে সম্যকরূপে নিয়ন্ত্রিত রাখার মতোই ব্যবস্থা। আজ আমাদের ওই ব্যবস্থার বিকৃতিগুলোকে দূর করে কীভাবে তাকে পুনঃস্থাপিত করতে পারি তা বিচার করা দরকার।

বর্ণ ব্যবস্থার মূল ভিত্তি হলো প্রাকৃতিক। বর্ণ, যেমনটা শ্রীমদ্ভগবদগীতায় বলা হয়েছে, গুণ ও কর্মের ভিত্তিতে তা নির্ধারিত হয়ে থাকে। গুণের অর্থ হচ্ছে— সত্য, রজঃ, তম এই তিন গুণ। এই গুণত্রয় সম্মিলিত ভাবে সব ব্যক্তির মধ্যেই বিদ্যমান। গুণের কম-বেশির ওপরে বর্ণ নির্ভর করে থাকে। যার সত্ত্বগুণ, রজোগুণ তমোগুণ ক্রমান্বয়ে প্রবল সে হচ্ছে ব্রাহ্মণ। যার রজোগুণ, সত্ত্বগুণ তমোগুণ ক্রমান্বয়ে প্রবল সে হচ্ছে ক্ষত্রিয়। যার রজোগুণ, তমোগুণ ও সত্ত্বগুণ ক্রমান্বয়ে প্রবল সে হলো বৈশ্য এবং যার তমোগুণ, রজোগুণ ও সত্ত্বগুণ ক্রমান্বয়ে প্রবল সে হচ্ছে শূদ্র। জন্ম-জন্মান্তরের কর্ম, কর্মফল ও তার ভোগশৃঙ্খলায় এই জন্মের জন্য যে সংস্কার গড়ে ওঠে তাকেই কর্ম বলে। গুণ ও কর্ম মানুষের প্রবৃত্তির কারণ। প্রত্যেক জন্মে মানুষের প্রাকৃতিক বর্ণ ভিন্ন ভিন্ন হয়ে থাকে। কিন্তু সামাজিক ব্যবস্থায় তা বংশানুযায়ীই প্রতিষ্ঠিত করা হয়েছে। অর্থাৎ ব্রাহ্মণকুলে জাত কোনো ব্যক্তি ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় কুলে জাত ব্যক্তি ক্ষত্রিয়, বৈশ্য কুলে জাত ব্যক্তি বৈশ্য এবং শূদ্রকুলে জাত ব্যক্তি শূদ্র বলে গণ্য করা হয়।

বর্ণ অনুসারে ব্যক্তির আচার, ব্যবসায় ও বিয়ে নির্ধারিত হয়। ব্রাহ্মণের কাজ মুখ্যত অধ্যয়ন করা, পৌরহিত্য করা ও চিকিৎসা করা। তাকে সমাজের জ্ঞান ও সংস্কারের রক্ষণাবেক্ষণ ও সংবর্ধন করা উচিত। পরম্পরা অনুযায়ী ব্রাহ্মণ রাজার পুরোহিত, মন্ত্রী ও অমাত্য থেকেছেন। ব্রাহ্মণকে সমাজের সকল বর্গকে নিজ নিজ কর্তব্য ধর্মের শিক্ষা দিতে হয় ও আবশ্যকতা অনুসারে পথনির্দেশ দিতে হয়। এই দৃষ্টিতে শুদ্ধতা, পবিত্রতা, তপস্যা, সংযম ও সাধনাই তার আচরণ। নিজের আচার পরিত্যাগকারী ব্রাহ্মণকে ব্রাহ্মণকুলে জন্ম নিলেও ব্রাহ্মণ বলা যায় না। আচারধর্মে কঠোরতা পালন করলে সমাজও তাকে আদর ও সম্মান প্রদান করে থাকে। এটা ব্রাহ্মণের বর্ণধর্ম। ব্রাহ্মণ যদি নিজ ধর্ম থেকে চ্যুত হয় তবে তার নিজের যা ক্ষতি হয় তার চেয়েও বেশি ক্ষতি হয় সমাজের। সংস্কার ও জ্ঞানের ক্ষেত্রে ভীষণ সংকট উৎপন্ন হয় । ফলস্বরূপ সমাজে নেমে আসে দুর্গতি। ক্ষত্রিয়ের কাজ যুদ্ধ করা, দুর্বলকে রক্ষা করা, দান করা এবং শাসন করা। তাকে অধ্যয়ন করতে হয় কিন্তু অধ্যাপনা নয়। শৌর্য তার স্বভাব, দান করা তার প্রবৃত্তি। আঘাত সহ্য করা তার স্বভাব। সে বৈভব ভোগ করে কিন্তু নিজের জীবনকে রক্ষা করার জন্য সে যুদ্ধক্ষেত্র থেকে পলায়ন করে না। বৈশ্যের কাজ সমাজের ভৌতিক পদার্থের আবশ্যকতাসমূহ পূরণ করা। অন্ন, বস্ত্র ইত্যাদি আবশ্যকতাগুলোর পূর্তির জন্য সে কৃষিকাজ করে থাকে। ভৌতিক সম্পদসমূহের সংরক্ষণ ও সংবর্ধন করে এবং সবাই যাতে নিজের আবশ্যকতা অনুযায়ী সামগ্রী উপভোগ করতে পারে তার ব্যবস্থা সে করে থাকে। সে বৈভবের মাঝে থাকে এবং লক্ষ্মীর উপাসনা করে। শূদ্র পরিচর্যা করে এমনটাই শ্রীমদ্ভগবদগীতায় উদ্ধৃত আছে। পরিচর্যার অর্থ হচ্ছে শরীর সম্বন্ধীয় কাজ করা। কিন্তু ব্যাপক অর্থে সে শরীরের জন্য আবশ্যক বস্তুসমূহ প্রস্তুত করে থাকে। সর্বপ্রকারের কারিগরি এবং অসংখ্য উপযোগী বস্তু প্রস্তুত করাই হচ্ছে শূদ্রের কাজ। শূদ্রকে আর্থিক দৃষ্টিতে নিরাপত্তা দেওয়া বৈশ্যের, তাকে রক্ষা করা ক্ষত্রিয়ের এবং তার সংস্কারকে রক্ষা করা ব্রাহ্মণের কর্তব্য। চার বর্ণের মধ্যে ব্রাহ্মণ সরস্বতীর, ক্ষত্রিয় দুর্গার, বৈশ্য লক্ষ্মীর এবং শূদ্র অন্নপূর্ণার উপাসক হয়ে থাকে। ব্রাহ্মণ জ্ঞান ও সংস্কারের উপাসনা করে সমাজের সংস্কৃতির এবং শূদ্র ভৌতিক সমৃদ্ধি সুনিশ্চিত করে। ক্ষত্রিয় এদের সবাইকে রক্ষা করে এবং বৈশ্য সমৃদ্ধি বিতরণের ব্যবস্থা করে। চার বর্ণই নিজ নিজ কাজ দ্বারা সমাজের সেবা করে থাকে। সেবাবৃত্তিকে রক্ষা করা এবং বাজারিকরণের বিকৃতি যাতে মাথাচাড়া দিতে না পারে সেটা দেখার দায়িত্ব ব্রাহ্মণের, কেননা সে ধর্মের শিক্ষা দিয়ে থাকে। যখন ব্রাহ্মণ নিজ দায়িত্ব ভুলে যায় তখন সমাজের দুর্গতি হয়। যখন ক্ষত্রিয় নিজ দায়িত্ব ভুলে যায় তখন সামাজিক সুরক্ষা নষ্ট হয়। যখন বৈশ্য নিজ দায়িত্ব ভুলে যায় তখন সমাজ দরিদ্র হয়ে পড়ে। যখন শূদ্র নিজ দায়িত্ব ভুলে যায় তখন সমাজ অসুবিধায় পড়ে যায়, কেননা তখন কোনো ব্যবসা বাণিজ্য চলতে পারে না। সমাজে এই চার বর্ণের প্রয়োজন এবং তাদের কাজের উত্তম ব্যবস্থাও দরকার। সবাই নিজ নিজ কাজ করুক এবং কারোর

যাতে কাজের অভাব না থাকে সেটা দেখা শাসকের কর্তব্য। এমন ব্যবস্থাকে স্বায়ত্ত সমাজ ব্যবস্থা বলা হয়। স্বায়ত্ত সমাজ ব্যবস্থায় বর্ণব্যবস্থা একটি গুরুত্বপূর্ণ অঙ্গ।

আজ এই ব্যবস্থার বিপর্যয় ঘটে গিয়েছে। যদিও জন্ম দ্বারাই বর্ণের মান্যতা দেওয়া হয় তথাপি সব বর্ণই আপন আপন ব্যবসায় ও আচার ত্যাগ করেছে। রাজ্যের ব্যবস্থায় বর্ণ কোনো অর্থ বহন করে না। রাজব্যবস্থায় কেবল ব্যবসায়ই নয়, বিয়েও বর্ণানুসারে করার কোনো বাধ্যবাধকতা নেই। কেবল কর্মকাণ্ডে, মানুষের মানসিকতায় এবং অনর্থক অহংকারকে পুষ্ট করার কাজে বর্ণের উল্লেখ করা হয়ে থাকে। বর্ণব্যবস্থা সর্বতোভাবে অব্যবস্থায় পরিণত হয়েছে এবং সামাজিক সামঞ্জস্য নষ্ট করে বিদ্বেষ বৃদ্ধির প্রথায় পরিণত হয়েছে। আচার, ব্যবসা ও বিয়ে এই তিন বিষয়কে মাথায় রেখে এই ব্যবস্থার পুনর্বিচার করবার প্রয়োজন দেখা দিয়েছে। সমাজ ধারণকারী এই ধর্মের বিশিষ্ট দিক।

ধর্মানুসারী সমাজব্যবস্থায় পরিবার সংস্থার একটি গুরুত্বপূর্ণ স্থান রয়েছে। পরিবারের কেন্দ্রবর্তী ঘটক হচ্ছে পতি-পত্নী। স্ত্রী ও পুরুষকে পতি-পত্নীতে পরিণত করার জন্য বিবাহ সংস্কার রয়েছে। মনুষ্যজীবনকে শ্রেষ্ঠ বানাবার জন্য সংস্কারের এবং তার মধ্যে নিত্য দ্বন্দ্বাত্মক স্বরূপের স্ত্রীধারা ও পুরুষধারার একাত্মতা সিদ্ধ করার জন্য বিবাহ সংস্কার এবং তার কল্পনাকারী ঋষিদের দূরদর্শিতার প্রশংসা যতই করা যায় ততই কম বলা হবে। বিবাহে স্ত্রী-পুরুষের একাত্মতা আশা করা হয় এবং তার আদর্শস্বরূপ শিব-পার্বতীর যুগলকে প্রতিষ্ঠিত করা হয়েছে। তাদের একাত্মতাকে অর্ধনারীশ্বরের প্রতিমায় ব্যক্ত করা হয়েছে। বিবাহের যে একাত্মতা তার বিস্তার হতে হতে 'বসুধৈব কুটুম্বকম্' এর সূত্রের সিদ্ধি পর্যন্ত পৌঁছানো যায়। পরিবারের ভাবাত্মক স্বরূপ হচ্ছে আত্মীয়তা। একেই পরিবারভাবনা বলা হয়। সম্পূর্ণ সমাজ ব্যবস্থায় পরিবার ভাবনা জড়িয়ে থাকে এমনটা কল্পনা করা হয়েছে।

স্ত্রী-পুরুষের সম্বন্ধকে পতি-পত্নীতে কেন্দ্রিত করে তার বিস্তার রূপে ভাই-বোন, মাতা-পিতা ও সন্তানের সম্বন্ধ বিকশিত করা হয়েছে। জগতের সব স্ত্রী-পুরুষের সম্বন্ধকে এতে সমাহিত করা হয়েছে। যার সঙ্গে বিয়ে হয়েছে তিনি ছাড়া অন্য সব পুরুষ স্ত্রীর জন্য ভাই, পুত্র অথবা পিতাসম। পুরুষের জন্য স্ত্রী ছাড়া অন্য সব মহিলা মাতা, কন্যা ও ভগিনীসম। এমন ধর্মবুদ্ধি সমাজকে অনাচারী হওয়া থেকে রক্ষা করে। স্ত্রী ও পুরুষের শীল রক্ষা করা সমাজ ধর্মের একটি গুরুত্বপূর্ণ দিক।

এভাবে আচার, ব্যবসায় ও বিবাহ ব্যবস্থার মাধ্যমে বর্ণধর্ম সমাজের রক্ষকের ভূমিকা পালন করে।

প্রকৃতি ধর্ম :

এই সৃষ্টিতে সমস্ত পদার্থেরই নিজ নিজ স্বভাব রয়েছে। তাকে ওই পদার্থের গুণধর্ম বলা হয়। তাকে তার প্রকৃতিও বলা হয়। মানুষ ছাড়া অন্য সমস্ত পদার্থের কেবল গুণধর্ম হয়ে থাকে। মানুষের গুণকর্ম হয়ে থাকে। এই গুণকর্মের আধারে তৈরি বর্ণব্যবস্থা ব্যবহারিক কারণে জন্মগত হয়ে গেছে। কিন্তু অবশিষ্ট সবার ব্যবস্থা গুণ কর্মানুসারেই তৈরি হয়েছে। মানুষকে যদি অবশিষ্ট সৃষ্টির সঙ্গে সামঞ্জস্য রাখতে হয় তবে এই প্রকৃতি ধর্মকেও জানা দরকার। মানুষ অপেক্ষা অবশিষ্ট সব পদার্থে ভৌতিক শক্তি ও প্রাণিক শক্তি অর্থাৎ অন্নময় ও প্রাণময় কোষ অনেক গুণ বেশি আছে। মানুষের বিচারশক্তি, বিবেকশক্তি ও সংস্কার শক্তি অবশিষ্ট সমস্ত পদার্থের থেকে তুলনামূলক বেশি আছে। এই বিশিষ্ট শক্তিগুলোর প্রভাবে সে সৃষ্টির সম্পদগুলি থেকে অপরিমিত লাভ নিতে পারে। লাভ পাবার সঙ্গে সঙ্গে সৃষ্টির সব পদার্থকে রক্ষা করা, তার প্রাপ্যের জন্য কৃতজ্ঞ থাকা, নিজ সুখের জন্য তাকে শোষণ না করা, তার সুন্দর স্থায়িত্ব বজায় রাখা মানুষের পরমধর্ম।

ধর্ম উপাসনারূপে :

ধর্মের এই স্বরূপ বড়োই অদ্ভুত। সঙ্গে সঙ্গে এটা মানুষের নব উন্মেষ, কল্পনাশক্তি ও সৃজনশীলতার এটা হচ্ছে এক অতুলনীয় আবিষ্কার। সৃষ্টির যে যে পদার্থ তার জীবন সুখময় তৈরি করেছে সেই সব তত্ত্বে সে দেবত্ব দেখতে পায়। মানুষ তার সঙ্গে একাত্মতা অনুভব করে তাকে কাব্যে স্থান দিয়েছে এবং অনেক প্রকারে তার গুণগান করেছে। দেবত্বের কল্পনার আধারে মূর্তির বিধান করেছে। মূর্তিবিধানে ভাবনা তো ছিলই সঙ্গে সঙ্গে প্রাকৃতিক পদার্থের স্বভাব ও ব্যবহারের পূর্ণজ্ঞানও ছিল আর ছিল নির্মাণ কৌশল। এইভাবে নিজের সমস্ত প্রকার ক্ষমতাগুলোর বিনিয়োগ আনন্দ ও কৃতজ্ঞতারূপে ব্যক্ত করে সে লৌকিক সুখের উন্নয়ন সাধন করল। ভৌতিক সমৃদ্ধি, জ্ঞান, পবিত্রতা, স্বাস্থ্য, পোষণ, সংযম, ত্যাগ ইত্যাদি সর্বপ্রকারের তত্ত্বগুলোর মূর্তরূপ দিয়ে তারা পূজা বিধান প্রস্তুত করল। এর মধ্যে বিভিন্ন উপাসনা পদ্ধতির বিকাশ ঘটাল। আমরা দেখি যে নানা প্রকার পূজা বিধির মধ্যে সৌন্দর্য আছে, কুশলতা আছে, নিশ্চয়তা আছে, ভাবনা আছে, আনন্দ আছে, কৃতজ্ঞতা আছে, পবিত্রতা আছে, নিজের তথা সবার সুখ ও কল্যাণের কামনা আছে। একাগ্রতা ও সমগ্রতার এটা হচ্ছে এক বিস্ময়কর আবিষ্কার। এই অনন্ত বিবিধতাপূর্ণ পূজা পদ্ধতির বিধানের জন্য শাস্ত্র তৈরি হলো। স্তোত্র তৈরি হলো ও সম্প্রদায় তৈরি হলো। এই সম্প্রদায় মানুষের মনকে, আচরণকে, সমস্ত আচার পদ্ধতিকে নিয়মের মধ্যে বাঁধার কাজ করল। অনেক দেবদেবী ও তার উপাসনা এবং তাদের উপাসনা বিধান এই বৈচিত্র্যের পরিচায়ক।

(ক্রমশ)

(ভাষান্তর : সূর্য প্রকাশ গুপ্ত, প্রাক্তন অধ্যাপক)

ভারত-বিরোধী সংবাদমাধ্যম এবং হিন্দু বিরোধিতা

ডাঃ আর এন দাস

আশি শতাংশ হিন্দুর দেশ ভারতে দেশবিরোধী কাজে লিপ্ত হওয়া ও হিন্দুনিন্দা করাই ইংরেজি সংবাদমাধ্যমগুলির দৈনন্দিন রুটিরোজির মধ্যে পড়ে। অনেক ক্ষেত্রেই মালিক তথা সম্পাদক হিন্দু নামধারী, মুসলমান বা খ্রিস্টান হয় যাদেরকে মতবাদের ভিত্তিতে পৃথক করা প্রায় অসম্ভব। তাদের মধ্যে অন্যতম ২৬.৪০ লক্ষ সার্কুলেশন বিশিষ্ট, বেনেট-কোলম্যানের টাইমস অব ইন্ডিয়ার সম্পাদক বিনীত জৈন। শোভনা ভারতীয়ার ছেলে শমিতের হিন্দুস্থান টাইমসের (সার্কুশেন ৯.৪৫ লক্ষ) আর তেমনিই হচ্ছেন, ৩.৯ লক্ষ সার্কুলেশনের ইন্ডিয়ান এক্সপ্রেসের বিবেক গোয়েঙ্কা।

এনডিটিভি, প্রিন্ট, স্ক্রোল ইত্যাদি অসংখ্য পত্রপত্রিকা শুধুমাত্র হিন্দু দেবদেবী, মন্দির, পূজাপদ্ধতি, রীতিনীতির বিরুদ্ধে ৭০ বছর ধরে সংবিধান ও আইনের চোখে ধুলো দিয়ে নির্বিবাদে বিষোদ্গার করেই চলেছে। স্বাধীনোত্তর কালে জওহরলাল নেহরু শিক্ষা-সংস্কারের ভার দিয়েছিলেন মেকলের সন্তানদের। কমিউনিস্টরা ইতিহাসকে বিকৃত করতে রক্তাক্ত ইসলামিক ইতিহাসকে মুছে জেএনইউ বা যাদবপুরের মতো বিশ্ববিদ্যালয়গুলিকে আবার ভারত বিভাজনের পীঠস্থান করেছিল। তারই পরোক্ষ প্রশ্রয়ে মুসলমানরা বলিউড নামক আমোদ-প্রমোদের মাধ্যমকে ভারতে ইসলামের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপনে লেগে, দীওয়ার, পদ্মাবতী ইত্যাদি ফিল্মের সৃষ্টি ও দাউদ গ্যাংয়ের সাহায্যে খানগ্যাংদের আমদানি করেছিল।

পাকিস্তান ও পাশ্চাত্যের ভারত বিরোধীতত্ত্বগুলি পে-রোলে এদের নাম আছে। এরা ‘টুকরে টুকরে গ্যাং’এর এবং শহুরে-নকসালদের কেতাবি শাখা, যাদের কাজই হচ্ছে, সত্যের অপলাপ করে, ইতিহাসকে বিকৃত করে, শিক্ষিত হিন্দুসমাজের মনে ভারতবিরোধী ভাবনা জোর করে ঢুকিয়ে দেওয়া যাতে সহজেই ভারতকে ভেঙে গাজওয়া-ই- হিন্দের লক্ষ্যে পৌঁছানো যায়।

কেন্দ্রে কংগ্রেস (ইয়ং ইন্ডিয়া) এবং রাজ্যে কমিউনিস্ট (গণশক্তি) সরকার সংবাদমাধ্যমগুলি দখল করে ভারতের মধ্যে থেকেই ভারতবিরোধী আন্দোলন চালিয়ে এসেছে ভারতেরই আইন, সংবিধানের ও ধূর্ত আইনজ্ঞদের (রাজীব ধাওয়ান, প্রশান্তভূষণ, কপিল সিব্বাল) সাহায্যে। বাচী করকারিয়া, জাগ সুরাইয়া, আকর প্যাটেল, রাজদীপ সারদেশাই, পুণ্যপ্রসূন বাজপেয়ী, শেখর গুপ্তা, বিনোদ দুয়া আশুতোষ, ধ্রুব রাঠী, শোভা দে, সাগরিকা ঘোষ ইত্যাদি অসংখ্য হিন্দু নামধারী এথেইস্ট, তথাকথিত ‘সেকুলার’ ও অসাম্প্রদায়িক সদাই সত্যের অনুসন্ধানকারীরা কেরল ও পশ্চিমবঙ্গকে আজ কাশ্মীরে পরিণত করেছে। দিল্লির ফ্রি-ল্যান্সার রাজিব শর্মা চীনকে সংবেদনশীল গোপনীয় মিলিটারি তথ্য পাচার করার অভিযোগে ১৪ সেপ্টেম্বর ধরা পড়তেই প্রেস ট্রাস্ট অব ইন্ডিয়ার বিজয় জোশী, অভিক সরকাররা তার উদ্ধারে ঝাঁপিয়ে পড়েছেন। অন্যদিকে, ওপইন্ডিয়া অজিত ভারতী, রিপাবলিকের অর্ণব গোস্বামী এবং জি-নিউজের সুধীর চৌধুরীকে প্রাণে মারার হুমকি, হাজারটা এফআইআর-এর সাহায্যে তাদের কণ্ঠরোধ করার ষড়যন্ত্র চলছে। অভিনেত্রী কঙ্গনা রানাউতকে সত্য বলার অপরাধে আজ মুম্বই ছাড়তে হয়েছে। দেশের ৭৩৯টি শহরের প্রতিটি কোণায় জেহাদিদের গোপন ঘুমন্ত-ঘরগুলি জতুগৃহের মতো অপেক্ষা করে আছে ‘ডাইরেক্ট অ্যাকশন ডে’র জন্য। পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী বলছেন, এসব হয়েছে বিজেপি, আরএসএস এবং মোদীর সাম্প্রদায়িকতার জন্য। বুদ্ধবাবু নিজে স্বীকার করেছিলেন, সীমান্তবর্তী অঞ্চলগুলিতে ব্যাঙের ছাতার মতো গজিয়ে উঠেছে জেহাদিদের আঁতুড়ঘর। সরকার নিশ্চুপ। সর্বোচ্চ আদালতের আদেশ অগ্রাহ্য করে মহরমের তাজিয়া ও তলোয়ারের আস্ফালন দেখেও অসহায় পুলিশ ও প্রশাসন নির্বাক। সবথেকে আশ্চর্য লাগছে, যখন দেখি

সনাতন হিন্দুধর্ম বা হিন্দুত্বে অজ্ঞ, তথাকথিত শহুরে শৌখিন পেশাদার লেখকরা বিদেশি মালিকের টাকায় ইংরেজি সংবাদপত্রগুলিতে জায়গা করে নিয়েছেন। অন্যদিকে আমেরিকার অদিতি ব্যানার্জি ও কৃষ্ণান রামস্বামীরা ‘ইনভেডিং দ্য সাক্রেড’ গবেষণাগ্রন্থে সুস্পষ্টভাবে দেখিয়েছেন, কীভাবে স্বদেশের জলবায়ুতে পুষ্ট, হিন্দুনামধারী পরজীবীরা সনাতনীদের বাপান্ত শ্রাদ্ধ করে নিজেদের উদরপূর্তি করছেন। কিন্তু আজ তাদের দিন শেষ হয়েছে।

দেশদ্রোহী মণিশংকর আয়ারের সুযোগ্য ভাই স্বামীনাথান টাইমস অব ইন্ডিয়ার সানডে টাইমসে মোদীভক্ত ও সঙ্গীদের বিরুদ্ধে বিষোদ্গার করেই নিজের পেট ভরাচ্ছেন। তিনি প্রয়াত মা-বাবাকেও নিজের নীচ স্বার্থসিদ্ধির জন্য রাজনৈতিক রণাঙ্গনে টেনে আনছেন।

ভারতীয় সংস্কৃতিতে অনভিজ্ঞ, হিন্দু নামধারী ছদ্মবেশী ভারত- বিদ্বেষী দুন স্কুল শিক্ষিত, সেন্ট স্টিফেন আর অক্সফোর্ড ফেরত রাজীব গান্ধীর যোগ্য উত্তরসূরি, স্বামীনাথান আয়ারের মতো কটাচামড়ার সাহেবের কাছে রামজন্মভূমি বা স্বাতন্ত্র্যবীর সাভারকরের কী মূল্য থাকতে পারে!

আন্তর্জাতিক এমনেস্টি মঞ্চের কট্টর মোদী-বিরোধী ও কংগ্রেসের মুখ্য-প্রচারক, ধারা ১৫৩ (দাঙ্গা করানো) এবং ১১৭-র (সরকারি সম্পত্তি ধ্বংস) অপরাধী, মদান্বিত, আকর আহম্মদ প্যাটেল ভারত বিরোধী কাজ অব্যাহত গতিতে চালাচ্ছেন এইসব ইংরেজি সংবাদমাধ্যমের সাহায্যে। ইংরেজি সংবাদমাধ্যমে লিখে ডলার বা পাউন্ড কামায়। লেখায় যত হিন্দু বা ভারতবিরোধী উগ্র-বিষ থাকে পারিশ্রমিকের পরিমাণও তত বেশি হয়। বিদেশে ভারতবিরোধী কার্যক্রম চালানোর সুবিধাও হয়। সেজন্যই নিউ ইয়র্ক টাইমসের সম্পাদক জোসেফ হোপ মোদীকে বিশ্বের অন্যতম বিপজ্জনক ব্যক্তি বলার সাহাস পান।

হিন্দু, বৌদ্ধ ও জৈন মন্দিরের উপর তৈরি হওয়া অসংখ্য মসজিদ, ৫০০ বছরের মুঘল শাসনে হিন্দুদের দৈন্যদশা, সহস্রাব্দের ইসলামিক অত্যাচারের করুণ কাহিনি বিজড়িত রামজন্মস্থানে ৫ আগস্টের ভূমিপূজনে কংগ্রেস ও কমিউনিস্টদের গাত্রদাহের বহিঃপ্রকাশ হয়েছে এইসব পত্রপত্রিকাগুলিতে। বাকস্বাধীনতার দোহাই দিয়ে ৮০ শতাংশ হিন্দুর স্বার্থহানি করে, সংখ্যালঘুদের ধর্মীয় স্বতন্ত্রতা, আর্থিক ও সামাজিক ন্যায়ের পক্ষে ক্রমাগত বিষোদ্গারে সাধারণ মানুষ আজ বিভ্রান্ত। গোধরা হত্যাকাণ্ডের সূচনা হয় ৫৯টি শিশু, বৃদ্ধ ও মহিলা-সহ করসেবকদের পেট্রোলস্নাত জীবন্তমৃত্যুর কারণে। সেটা ধামাচাপা দিয়ে মুসলমান হত্যাকারীদের বাঁচানোর জন্য এইসব পত্রিকার পেশাদার লেখকেরা গোয়েবলীয় পদ্ধতিতে দেশে-বিদেশে প্রাচার চালিয়ে ছিলেন।

অযোধ্যায় ৫০০ বছরের নিরন্তর সংঘর্ষ ও লক্ষাধিক ভক্তের রক্তরঞ্জিত রামজন্মভূমির শিলান্যাস,এইসব ধূর্ত লেখকের কাছে তুচ্ছ ব্যাপার। 'ঈশ্বর সর্বত্র, বাবরি না ভেঙে অন্য স্থানে কেন করা হবে না রামমন্দির'-এ কথার মধ্যেই প্রকাশ পায় তাদের ছদ্মবেশী অন্তঃকরণ। অর্থাৎ বর্বর বাবর ও মির বাকিকে তাদের কথায় শ্রীরামের জায়গায় স্থান দিতে হবে। দিল্লিতে কুতুবউদ্দিন আইবক ২৭টি জৈনমন্দির ধ্বংস করে কুতুবমিনার এবং রাজস্থানে মাউন্ট আবুর উপর অসংখ্য জৈনমন্দির ধ্বাস করে মসজিদ বানিয়েছে। হিন্দুদের ধর্মান্তরতি করেছে তলোয়ারের ডগায়। স্বামীজীর অনুমানে ৪০ কোটি নির্দোষ হিন্দু পৌত্তলিকতার অপরাধে নিহত হয়েছে এবং অসংখ্য নারী ধর্ষিতা নয়তো তুর্কি ও আরবের বাজারে বিক্রি করা হয়েছে। অসংখ্য শিশু ও বৃদ্ধবৃদ্ধাকে আগুনে পুড়িয়ে মারা হয়েছে শুধুমাত্র হিন্দু হওয়ার অপরাধে। কই এসব কথা তো তাঁরা কখনও লেখেন না!

তাদের মতে, মোদীর রামজন্মভূমি 'ফায়দা লোটার জন্য নিছকই রাজনৈতিক কায়দা'। বিকারগ্রস্তের প্রলাপোক্তি ছাড়া আর কী! 'সেকুলার' ফুলবাবু, দুষ্ট, নাস্তিক স্বামীনাথন কি খ্রিস্টানদের জেরুজালেম ছাড়া অন্য কোথাও চার্চ কিংবা অসংখ্য হজযাত্রীকে মক্কা ছাড়া অন্য কোথাও মসজিদ বানানোর কথা বলতে পারবেন? মৃত্যুভয়ে ভীত মণিশংকর আয়ারেরই ভাই কিনা! একচক্ষু বিশিষ্ঠ মুসলমান মার্কিস্ট ইতিহাসকার ইরফান হাবিব ও রোমিলা থাপার সনাতন ভারতের বিকৃত ইতিহাসের রচয়িতা। আজ পাঁচ-জি ইন্টারনেটের যুগে বিকৃত ইতিহাসের এইসব মেকি দিক্‌পালদের উপর আর নির্ভর করতে হয় না। পশ্চিমের বস্তাপচা সমাজবাদকে ৭০ বছরেই চোখের সামনে বিধ্বস্ত হতে দেখেছি। ভারতের রাজনীতিতে ৭০ বছরে কংগ্রেস হিন্দুত্বের জোরে জাতীয়তাবোধে উদ্বুদ্ধ হয়ে সংখ্যাগরিষ্ঠের পার্টি বিজেপি শুধু কেন্দ্রেই নয় রাজ্যগুলিতেও আজ সরকার গঠন করছে অবলীলায়। রক্তাক্ত ভারতের ক্ষতবিক্ষত ইতিহাসে অনভিজ্ঞ কল্পকাহিনিকারদের কোনো স্থান নেই বা অধিকার নেই ভারতীয় তথা সমগ্র বিশ্বের জনমানসে ধোঁকাধারি করে বর্বর ইসলাম ও ক্রুর ব্রিটিশের নৃশংস ইতিহাসকে মুছে ফেলার। তাদেরকে অনুরোধ করবো, পড়ুন, সীতারাম গোয়েলের 'হিন্দু টেম্পলস ঃ হোয়াট হ্যাপেন টু দেম?' বা প্রফুল্ল গোরাদিয়ার লেখা, 'হিন্দু মসজিদ্‌স'।

এসব বকধার্মিক, নকল-সাধুর হাস্যকর এবং অযৌক্তিক লেখা পাঠকমনে যথেষ্ট সন্দেহের উদ্রেক করে। ভারতবিদ্বেষী মণিশংকর ও স্বামীনাথন দুই নাস্তিক পুত্রের জন্মদাত্রীকে কেন ঋষিকেশে শিবানন্দ আশ্রমে ২০ বছর নির্বাসিত হতে হয়েছিল? মিলিয়ন ডলারের প্রশ্ন, ১৯৯২ সালে হিন্দু জনতা 'মহান বাবরি ধাঁচা' কেন ধ্বংস করল? সেটা উর্বর মস্তিষ্কের, শুস্ক গ্রে-ম্যাটার ধারণা করতে পারবে না। সেজন্য চাই সংবেদনশীল হৃদয়। ইংরেজি জানা এসব অর্বাচীনদের বলবো ডাঃ ডেভিড ফ্রাওলে ফ্রাঁসোয়া গোটিয়ার, কয়েনার্ড এলস্টের লেখাগুলি পড়ুন। এরা কেউই বিজেপি বা আরএসএস করেন না।

অবাক লাগে, একজন পাকিস্তানপন্থী উদুপ্রেমী মণিশংকর লাহোর ও ইসলামাবাদে শরাব ও গোস্তে মশগুল থাকেন, অন্য ফুলবাবুটি নিজেকে নিরীশ্বরবাদী বলে হিন্দুধর্মের কড়া সমালোচনা করার সাহস পান কিন্তু ইসলাম বা খ্রিস্টান ধর্মের ব্যাপারে ভীতসন্ত্রস্ত থাকেন। পাছে প্রাণটি যায়। নিজেরই অত্যাচারিত পূর্বপুরুষের প্রতিচ কোনো সহানুভূতি নেই।

মেকলেপন্থী বা কোনো মুসলিম সন্তানেরই সনাতন ধর্মের প্রতি এরকম অস্বাভাবিক গভীর ঘৃণা থাকতে পারে। অসংখ্য করসেবক যারা দেশের প্রতিটি প্রান্ত থেকেই সমবেত হয়েছিল, স্বামীনাথনের কাছে তারা শুধু বাবরি-ধ্বংসকারী 'হিন্দু-দুর্বৃত্ত'!

সহস্রাব্দের জিহাদি আক্রমণে বিধ্বস্ত

অগণিত হিন্দু বৌদ্ধ জৈনমন্দির, অসংখ্য গণহত্যার নায়ক বাবর ও তার বংশধরদের অকথ্য অত্যাচার এইসব খয়েরখাঁদের দৃষ্টির অন্তরালে থাকে। আজও বাংলাদেশ, পাকিস্তান থেকে হিন্দু মেয়েদের অপহরণ করে মধ্যপ্রাচ্যের বাজারে গণিকাবৃত্তি করানো হচ্ছে, সেইসব হিন্দুনামধারী কাপুরুষদের বলি পড়ুন রাণাপ্রতাপ, শিবাজী মহারাজ ও গুরু তেগবাহাদুরের বীরগাথা।

আজও সেই ট্রাডিশন সমানে চলছে। ইরাকের ইয়েজাদি মেয়েদের উপর নিদারুণ অত্যাচারের করুণ কাহিনি আজ সারাবিশ্ব জানে। তালিবানিদের দ্বারা বামিয়ান বুদ্ধের ধ্বংসের কথা কি তারা জানেন না? বর্বর ঔরংজেবের অমরকীর্তির সাক্ষ্য আজও বিদ্যমান। বেনারসের জ্ঞানব্যাপী মন্দিরটিকে ১৬৬৪ খ্রিস্টাব্দে কীভাবে মসজিদ বানানো হয়েছিল, মীনাক্ষী জৈনের লেখা, 'ভারতের মধ্যযুগীয় ইসলামিক ইতিহাস' পড়ুন যা আজ রোমিলা থাপারকে ছাপিয়ে গেছে। লজ্জায় মাথা নত হয়ে যাওয়ার পরিবর্তে তারা দম্ভের সঙ্গে 'লিট-ফ্রেস্ট' করছেন। ধিক এইসব পরজীবীদের যারা পাকিস্তানের আইএসআই ও পশ্চিমের ম্লেচ্ছদের কাছ থেকে মাসিক বেতনে পরিণত হচ্ছেন শুধুমাত্র অত্যাচারিত দেশমাতৃকা ও পূর্বপুরুষদের নিন্দা করার জন্য।

সনাতন হিন্দুধর্ম বা হিন্দুত্বে অজ্ঞ, এসব তথাকথিত শহরে শৌখিন পেশাদার লেখকরা বিদেশি মালিকের টাকায় ইংরেজি সংবাদপত্রগুলিতে জায়গা করে নিয়েছেন। অন্যদিকে আমেরিকার অদিতি ব্যানার্জি ও কৃষ্ণান রামস্বামীরা 'ইনভেডিং দ্য সাক্রেড' গবেষণাগ্রন্থে সুস্পষ্টভাবে দেখিয়েছেন, কীভাবে স্বদেশের জলবায়ুতে পুষ্ট, হিন্দুনামধারী পরজীবীরা সনাতনীদের বাপান্ত শ্রাদ্ধ করে নিজেদের উদরপূর্তি করছেন বহুদশক ধরে। কিন্তু আজ তাদের দিন শেষ হয়েছে। হিন্দুধর্ম এদের কাছে গ্রাম্য-মন্দির ও গৃহকোণে সাজানো রাধা-কৃষ্ণের পটের মধ্যেই সীমায়িত। অথচ চোখের সামনে তিরুপতি, জাঞ্জাভুর, মীনাক্ষীপুর, কাঞ্চিপুরম, পদ্মনাভন, রামেশ্বর, বৈষ্ণদেবী, বদ্রীনাথ, পুরীর জগন্নাথ, দিল্লির শিসগঞ্জ গুরুদ্বারা, অমৃতসরের হরমন্দির সাহিব, কাশী বিশ্বনাথ মন্দির, বৃন্দাবনের বাঁকেবিহারী, মুম্বইয়ের সিদ্ধিবিনায়ক, অসমের কামাখ্যা, পনঢারারপুরের বিঠোবা, কলকাতার কালিঘাট, গুজরাটের সোমনাথ ও বেনারসের ভব্য ও বিশালকায় মন্দিরগুলি, শত বাধাবিপত্তি, ধ্বংস ও আক্রমণ অতিক্রম করে আজও বহন করে চলেছে আবহমানকাল যাবৎ প্রবাহিত সনাতন ধর্মের অস্তিত্ব। বেনারস নগর উন্নয়নের খনন কার্যে উদ্ধার হয়েছে অসংখ্য বিধ্বস্ত হিন্দু মন্দির মুসলমানের ঘর, মসজিদ বা কবরের নীচে। কিন্তু তারা জেনেও নিশ্চুপ হয়ে বসে আছেন বিদেশি মাস্টারদের ভয়ে। খ্রিস্টপূর্ব ৫০৭-তেই কেরলের শঙ্করাচার্য পায়ে হেঁটেই ভারতের চার চৌহদ্দিতে চারটি মঠ নির্মাণ করেছিলেন। বিভিন্ন প্রদেশের ভাষা ও বেশভূষা ভিন্ন কিন্তু সনাতন ধর্ম এক। তাইতো পূর্বে পুরীর গোবর্ধন, পশ্চিমের দ্বারকা, উত্তরে বদরিকাশ্রম এবং দক্ষিণে কাঞ্চী আজও বিদ্যমান।

ধর্মান্তরে লিঙ্গচ্ছেদ অন্যথায় মুণ্ডচ্ছেদ— এই ছিল জিহাদিদের ভাষা। যার প্রভাবে আজ সারাবিশ্ব থরহরি কম্পমান। মোগল বাদশা জাহাঙ্গিরের সময় থেকেই ইসলাম এবং হিন্দুসংস্কৃতির সমন্বয় করে হিন্দুর চোখে ধুলো দিয়ে হিন্দুরমণী ভোগ করে উন্নত প্রজননের সাহায্যে মরুভূমির বর্বর ও কর্কশ সম্প্রদায়ের দানবরা দেবতা হতে চেয়েছিল। 'গঙ্গা-যমুনা তহজীবে'র প্রবর্তকরা ভালো করেই জানেন, 'আল তাকিয়া' কী জিনিস! জিহাদি-কমিরা জানে না, ভারতের গণ্ডি ছাড়িয়ে পৃথিবীর বৃহত্তম মুসলমান দেশে ইন্দোনেশিয়ায় রাম-সীতার পূজা মুসলমানরাই করে। মুসলমান দস্যুরা লুট করতো মন্দিরের ধনসম্পদ। আগুন লাগিয়ে দেওয়া, স্বর্গীয় সৌন্দর্যে পরিপূর্ণ মন্দিরের ভাস্কর্য ও মূর্তিগুলির কলাকৃতিকে সহ্য করতে না পেরে সেগুলিকে পাশবিক শত্রুতায় ধ্বংস করে ধর্ষণকামী উন্মাদনায় দানবীয় আনন্দ উপভোগ করতো। কই এসব লেকার সাহস তো নেই পেশাদার লেখকদের!

সাহসী ঘনশ্যামদাস বিড়লা ৭০০ বছর পরে দিল্লিতে লক্ষ্মী- নারায়ণের প্রথম হিন্দুমন্দিরটি নির্মাণ করেছিলেন ১৯৩৯ সালে। মধ্যযুগটি ছিল মুঘলদের স্বর্ণময় অধ্যায়। মুঘলের গোলাম হয়ে নিজদেশে পরবাসী হয়েছিল হিন্দুরা। হতভাগ্য দরিদ্র দলিত কন্যাদের বিবাহের মণ্ডপ থেকেই তুলে নিয়ে যাওয়া হতো স্থানীয় সুলতানের হারেমে প্রথম তিনরাত্রির ভোগের উদ্দেশ্যে। সেকথা কি মীম-ভীমের অধ্যক্ষ চন্দ্রশেখর আজাদ রাবণ, নগেন্দ্র পাশোয়ান, ওবেসির পা-চাটা যোগেন্দ্র যাদব ও মায়াবতীরা জানেন না? এখনও পাকিস্তান ও উত্তর কাশ্মীরের বাল্মীকিদের অবস্থার বিশেষ কোনো পরিবর্তন হয়নি। মৃতের উদ্দেশ্যে উচ্চস্বরে ক্রন্দন, পাগড়ি বা উষ্ণীষ পরা, ঘোড়ায় চড়া, তলোয়ার হাতে রাখা, জন্মাষ্টমী বা হোলি পালন, মন্দিরে পূজা করা সে যুগে নিষিদ্ধ ছিল। ধর্মের ভিত্তিতে দ্বিখণ্ডিত ধর্মনিরপেক্ষ ভারতে জামাতিয়া লালু-অখিলেশ যাদবরা ও মমতার মতো হিন্দুবিদ্বেষীরা জিজিয়া কর চাপিয়ে সংখ্যাগরিষ্ঠ হিন্দুর টাকায় মসজিদ, ইমাম ভাতা, হজ টাওয়ার বানিয়ে দিয়েছে শুধুমাত্র জিহাদিদের ভয়ে আর সংখ্যালঘু ভোটের লালসায়।

ভারতে বিচ্ছিন্নতাবাদী শক্তিকে পরাস্ত করতে অনেকেই আজ আগুয়ান। দুর্ভাগ্যবশত রাষ্ট্রভক্ত জেনেরেল গগনদীপ বক্সি, মধু কিসওয়ার অথবা পুষ্পেন্দ্র কুলশ্রেষ্ঠরা আমার প্রবন্ধগুলো পড়তে পারবেন না। আমরা শেষদিন পর্যন্ত জিহাদি, মাওবাদী, কংগ্রেস- কমিউনিস্ট ও দেশদ্রোহীদের বিরুদ্ধে লড়াই চালিয়ে যাব। দেশদ্রোহীদের স্তব্ধ করার জন্য এফসিআর অ্যাক্টের মতো আইপিসি ১২৪-এর (রাষ্ট্রদ্রোহ) চেয়েও কড়া আইন চাই। তাহলেই ত্রিপুরার সিপিএম সাংসদ ঝর্ণা দাসবৈদ্যের মতো টিএমসি-র অনুব্রত মণ্ডলের হুংকারও নিশ্চয়ই একদিন বন্ধ হয়ে যাবে। □

বিশেষ প্রতিবেদন

বাবরি ধাঁচা বিলয়ের রায়দানে হিন্দুসমাজ উচ্ছ্বসিত

সুব্রত বন্দ্যোপাধ্যায়

২৮ বছরের অপেক্ষার বলা ভুল, কালিমালিপ্ত করার প্রচেষ্টার অবসান হলো। অভিযুক্ত ৩২ জনকেই সিবিআই আদালত বাবরি মামলায় নির্দোষ ঘোষণা করেছে। এদের মধ্যে রয়েছেন নবতিপর আদবাণীজী, জোশীজী, শ্রীমতী উমাভারতী, কল্যাণ সিংহ (যিনি তাঁর নির্বাচিত সরকারটিকেই বিসর্জন দিয়েছিলেন)। সিবিআইয়ের বিচারপতি এস কে যাদব তাঁর দীর্ঘ ২৩০০ পাতার রায়ে দ্ব্যর্থহীন ভাষায় জানিয়েছেন ৬.১২.৯২-এ বাবরি ধাঁচা বিলয়ের ক্ষেত্রে কোনো পূর্ব পরিকল্পিত চক্রান্ত ছিল না। এ ছিল মানুষের স্বর্তস্ফূর্ত আবেগের বিস্ফোরণ। তিনি সমস্ত রকমের চক্রান্তের তত্ত্বকে বানচাল করে রায়ের অংশবিশেষে বলেছেন অভিযুক্তদের বিরুদ্ধে অভিযোগ ছিল ভিত্তিহীন, বানানো।

১৯৯০ সালে অক্টোবরে আদাবাণীজীর ভারতব্যাপী অসাড় হিন্দু জনতাকে জাগানোর রথযাত্রার যে কর্মসূচি ছিল (যার জন্য মিলিজুলি কেন্দ্রীয় সরকারও বিজেপি খোয়াতে দ্বিধা করেনি) অযোধ্যার জনরোষ তাঁরই যুক্তিসঙ্গত চূড়ান্ত সমাপ্তি। সংখ্যাগরিষ্ঠ হিন্দুসমাজকে দাবিয়ে রাখার যে প্রচেষ্টা স্বাধীনতার জন্মলগ্ন থেকে শুরু হয়েছিল এ ছিল তার বিরুদ্ধে প্রথম অগ্নি স্ফুলিঙ্গ। এরপর ক্রমান্বয়ে দেশের রাজনৈতিক ইতিহাসে কী বিপুল পট পরিবর্তন হতে শুরু করে তা সকলেই সুবিদিত। প্রধান বিবেচ্য হচ্ছে সরাসরি পরিকল্পিত চক্রান্তের অভিযোগকে নস্যাৎ করে দিয়ে বিচারপতিরা প্রমাণ করেছেন যে তাঁরাও অনুধাবন করতে সক্ষম যে বাবরি বিলয় দীর্ঘ অবদমিত একটি জাতির ক্ষোভের অন্তিম পরিণতি। তাঁরা এই আন্দোলনের আর এক পথিকৃৎ প্রয়াত অশোক সিঙ্ঘলের বিশ্ব হিন্দু পরিষদকেও চক্রান্তের অভিযোগ থেকে অব্যাহতি দিয়েছেন। সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য হলো মহামান্য বিচারপতিরা এমনটা বলেছেন যে, জনতাকে উত্তেজিত করা দূরস্থান, আদবাণী প্রমুখ তাদের শান্ত করার প্রবল চেষ্টা করেছিলেন। তাঁরা বাস্তবে বাবরি ধাঁচা রক্ষার পক্ষে ছিলেন।

আজকে আদবাণীর মুখের প্রথম দুটি শব্দ ছিল আবেগতাড়িত 'জয় শ্রীরাম'। তিনি প্রাথমিক প্রতিক্রিয়ায় বলেছেন, ''এ এক ঐতিহাসিক রায়। সমগ্র দেশবাসীর পক্ষে এক আনন্দের দিন। চক্রান্তের তত্ত্বকে নস্যাৎ করা এই রায় রামজন্মভূমি আন্দোলনে বিজেপির এবং তাঁর ব্যক্তিগত বিশ্বাস ও দায়বদ্ধতারই প্রমাণ।'' বাস্তবিক দেশের প্রথম সারির সব নেতা যাঁরা উপপ্রধান মন্ত্রী, গৃহমন্ত্রী, মুখ্যমন্ত্রী হয়ে সফল ভাবে দেশ চালিয়েছেন, জাতিকে গৌরবান্বিত করেছেন, সমগ্র বিশ্ববাসীর কাছে তাঁদের হেয় করে নগণ্য অপরাধী বানানো ঘৃণ্য অপচেষ্টার সমাপ্তি আদতে একটি ধারাবাহিক মিথ্যা যুগেরই অবসানের অনিবার্য পরিণতি। বলা দরকার, রায়দানে উঠে এসেছে সিবিআই ধাঁচার সেই মুহূর্তের যেসব ফটো নেগেটিভের কথা বলেছিল তার কিছুই তারা প্রমাণ হিসেবে হাজির করতে পারেনি। বিনয় কাটিয়ারের বাড়িতে কোনো বৈঠকও হয়নি। জমা দেওয়া ভিডিয়োগুলিতে কোনো মিল ছিল না, বাস্তবে এই সাজানো মামলার ক্ষেত্রে বিচারকদের বুদ্ধি বিবেচনায় অভিযুক্তদের নির্দোষ ঘোষণা না করলে হয়তো তাঁরা বিবেকের কাছে বিদ্ধ হতেন। হায়! শশী থারুর আপনি ২০০১ সালে অযোধ্যা নিয়ে করসেবক ও তার নেতাদের অভিযুক্ত করে 'রায়ট' নামে আস্ত একটা বই লিখে ফেলেছিলেন। আপনার উর্বর মস্তিষ্কে সেখানে আবার করসেবকের হাতে এক ভারতীয় জেলাশাসকের বিদেশি বউকে খুন করাতেও আপনি পিছপা হননি। অথচ করসেবকদের গুলি খাওয়া আপনার সমবেদনা পায়নি।

তাই মিথ্যা অভিযাত্রা সমাপনের হয়তো সূচনা হলো ২৮ বছর পর(রাম বনবাসের ১৪ বছরের ডবল সময়ে)। সত্যমেব জয়তে। □

বিদ্যাসাগর
এক অনন্য জীবন

সাগ্নিক বন্দ্যোপাধ্যায়

'বিদ্যার সাগর তুমি বিখ্যাত ভুবনে। করুণার সিন্ধু তুমি, সেই জানে মনে, দীন যে দীনের বন্ধু।' এই বিখ্যাত কবিতার স্রষ্টা হলেন মাইকেল মধুসূদন দত্ত। এই কবিতা আজ থেকে দ্বিশতবর্ষ আগে মেদিনীপুরের বীরসিংহ গ্রামে জন্মগ্রহণ করা সিংহপুরুষের উদ্দেশ্যে নিবেদিত। সেই সিংহপুরুষই হলেন ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর। মাইকেল মধুসূদন দত্ত ইংল্যান্ডে যখন আর্থিক কষ্টে ভোগেন তখন বিদ্যাসাগর তাঁর সাহায্যার্থে এগিয়ে আসেন। এইভাবে যেন মধুসূদন দত্তের পুনর্জন্ম দেন। ১৮২০ সালের ২৬ সেপ্টেম্বর বঙ্গপ্রদেশ তথা ভারতের নবজাগরণের ইতিহাসে এক স্বর্ণোজ্জ্বল দিন। এই দিনে ঈশ্বরচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের আবির্ভাবে সমগ্র বঙ্গভূমি এক নতুন আলোর সন্ধান পেল। ছেটোবেলা থেকে তাঁর জীবন অতি কষ্টে কেটেছে। কিন্তু লক্ষ্যে অবিচল বিদ্যাসাগর কখনো জীবনযুদ্ধে পরাজিত হননি। ছোট্ট বিদ্যাসাগর তাঁর পিতা ঠাকুরদাস বন্দ্যোপাধ্যায়ের সঙ্গে কলকাতায় আসেন। বীরসিংহ গ্রাম থেকে কলকাতায় আসার এই পথ তাঁর কাছে এক শিক্ষার তীর্থযাত্রা হয়ে ওঠে। আসার পথে রাস্তায় মাইলস্টোন দেখে ইংরেজি সংখ্যা শিখে নেন। এ এক অভিনব শিক্ষাদান পদ্ধতি। এরপর তিনি ১৮২৯ সালের ১ জুন কলকাতা গভর্নমেন্ট সংস্কৃত কলেজে ব্যাকরণের তৃতীয় শ্রেণীতে ভর্তি হন। তিনি ব্যাকরণের পাশাপাশি ইংরেজি, অলঙ্কারশাস্ত্র প্রভৃতি বিষয়ে পড়াশোনা করে বিশেষ জ্ঞানার্জন করেন। তিনি বিভিন্ন পরীক্ষায় প্রথম স্থান অধিকার করেন। ১৮৩৯ সালের ২২ এপ্রিল হিন্দু ল' কমিটির পরীক্ষায় কৃতিত্বের সঙ্গে উত্তীর্ণ হন। ১৬ মে ল' কমিটির কাছ থেকে একটি প্রশংসাপত্র লাভ করেন। যাতে তাঁর নামের সঙ্গে প্রথম 'বিদ্যাসাগর' উপাধিটি ব্যবহৃত হয়। প্রশংসাপত্রটি দেওয়া হলো :

HINDOO LAW COMMITTEE OF
EXAMINATION

We herreby certify that at an Examination held at thed Presidency of Fort William on the 22nd Twenty-second April 1839 by the committee appointed under the provisions of Regulation XI 1826 Issur Chandra Vidyasagar was found and declared to be qualified by his eminent knowledge of the Hindoo Law to hold the office of Hindoo Law officer in any of the Established courts of Judicature.

H.T. Prinsep
President
J.W.J. Ousely
Memder of the Committee of Examination

This certificate has been granted to the said Issur Chandra Vidyasagar under the seal of the committee. This 16th Sixteenth day of May in the year 1839 corresponding with the 3rd Third Joistha 1761 Shukavda.

J.C.C. Sutherland
Secy to the Committee.

এছাড়া ১৮৪১ খ্রিস্টাব্দে ডিসেম্বর মাসে সংস্কৃত কলেজ থেকেও তিনি একটি শংসাপত্র লাভ করেন। সেখানেও কলেজের অধ্যাপকগণ ঈশ্বরচন্দ্রকে 'বিদ্যাসাগর' নামে অভিহিত করেন। নিম্নে প্রশংসাপত্রটি দেওয়া হলো :

অস্মাভি : শ্রী ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর
প্রশংসাপত্রং দিয়তে। অসৌ কলকাতায়াং
শ্রীযুত কোম্পানি সংস্থাপিত বিদ্যামন্দিরে ১২
দ্বাদশ বৎসরান ৫
পঞ্চমাসাংশ্চোপস্থায়াধোলিখিত শাস্ত্রাণ্য
ধীতবান
ব্যাকরণ...শ্রীগঙ্গাধর শর্ম্মভিঃ
কাম্যশাস্ত্রম্...শ্রীজয়গোপাল শর্ম্মভিঃ
অলঙ্কারশাস্ত্রম্...শ্রীপ্রেমচন্দ্র শর্ম্মভিঃ
বেদান্তশাস্ত্রম্...শ্রীশম্ভুচন্দ্র শর্ম্মভিঃ
ন্যায়শাস্ত্রম্...শ্রীজয়নারায়ণ শর্ম্মভিঃ
জ্যোতিঃশাস্ত্রম্...শ্রীযোগধ্যান শর্ম্মভিঃ
ধর্মশাস্ত্রম্...শ্রীশম্ভুচন্দ্র শর্ম্মভিঃ

সুশীলতয়োপস্থিতস্বৈত স্বৈতেষু শাস্ত্রেষু সমীচীনা ব্যুৎপত্তিরজনিষ্ট। ১৭৬৩ এতচ্ছকাব্দীয় সৌরমার্গশীর্ষস্য বিংশতি দিবসীয়ম্

Rasamoy Dutt.

Secretary.

10 December 1841

প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, তৎকালীন সমাজে বহু পণ্ডিত ব্যক্তিকে 'বিদ্যাসাগর' উপাধিতে ভূষিত করা হতো। কিন্তু বিদ্যাসাগর বললেই আমাদের মানসপটে কেবল ঈশ্বরচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের নামই ভেসে ওঠে। এর কারণ হলো সমাজের প্রতি তাঁর অবদান।

ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর ১৮৫১ সালের ২২ জানুয়ারি সংস্কৃত কলেজের অধ্যক্ষ হিসেবে নিযুক্ত হন। এই সময় সংস্কৃত কলেজে বহু সংস্কার সাধন করেন। ১৮৫১ সালের ৯ জুলাই থেকে পূর্বতন রীতি বদলে ব্রাহ্মণ বৈদ্যের সঙ্গে কায়স্থদের সংস্কৃত কলেজে অধ্যায়নের সুযোগ করে দেন। তিনি বুঝেছিলেন সমাজের সর্বস্তরের মানুষের মধ্যে জ্ঞানের বিকাশ ঘটলে তবেই বঙ্গ তথা ভারতবর্ষ এগোতে পারবে। তিনি ২৬ জুলাই রবিবারের সাপ্তাহিক ছুটি প্রথার ঘোষণা করেন। আগে সংস্কৃত কলেজ প্রতি অষ্টমী ও প্রতিপদ তিথিতে ছুটি দেওয়া হতো। এরপর ডিসেম্বর মাসে তিনি সকল বর্ণের মানুষের জন্য সংস্কৃত কলেজের দ্বার উন্মুক্ত করেন এবং কলেজে প্রবেশার্থী শিক্ষার্থীদের ২ টাকা দক্ষিণা প্রথা চালু করেন। বিদ্যাসাগর উপলব্ধি করেছিলেন তৎকালীন অন্ধকারাচ্ছন্ন সমাজকে আলোর দিকে উত্তরণ করতে গেলে মাতৃভাষার পাশাপাশি ইংরেজি শিক্ষা গ্রহণ আবশ্যক। তিনি অনুভব করেন ইংরেজি ভাষা না জানলে ব্রিটিশ শাসনের কুফল ও সুফল কোনোটাই মানুষ বুঝতে পারবে না। তাই বিদ্যাসাগর সংস্কৃত কলেজে মাতৃভাষার পাশাপাশি ইংরেজি ভাষাকে আবশ্যিক করেন। এর পাশাপাশি তিনি ইংরেজি গণিতকে পাঠ্যসূচির অন্তর্ভুক্ত করান। বিদ্যাসাগর চেয়েছিলেন শিক্ষার্থীরা প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য উভয় দর্শনেই পারদর্শী হতে পারে। তার জন্য তিনি ভারতীয় দর্শনের পাশাপাশি মিলের তর্কশাস্ত্রকেও পাঠ্যসূচির অন্তর্ভুক্ত করেন। এ বিষয়ে আমরা বেনারস সংস্কৃত কলেজের অধ্যক্ষ ড. ব্যালেন্টাইন ও বিদ্যাসাগরের অসাধারণ বাক্যালাপ উল্লেখ করতে পারি। ১৮৫৩ সালে কলকাতায় এসে ড. ব্যালেন্টাইন বলেন যে, দুই ধরনের দর্শন পাঠ করলে ছাত্রদের বিভ্রান্তি দেখা দেবে এবং তাদের ধারণা হবে যে সত্য দু' রকমের। কিন্তু ১৮৫৩ সালের ৭ সেপ্টেম্বর বিদ্যাসাগর তাঁর বক্তব্যের উত্তরে বলেন— সত্য যে হিন্দু দর্শন পদ্ধতি সাম্প্রতিক পাশ্চাত্য দর্শনের অগ্রবর্তী ধারণাগুলির সঙ্গে একেবারেই মেলে না। কিন্তু একজন ভালো সংস্কৃত পণ্ডিতের হিন্দু দর্শন জানা জরুরি। তিনি যদি একই সঙ্গে আধুনিক পাশ্চাত্য দর্শনে পাণ্ডিত্য অর্জন করেন তবে তাঁর পক্ষে প্রাচীন হিন্দু দর্শনের ভুলভ্রান্তিগুলি ধরা অনেক সহজ হবে। এখানে বলে রাখা ভালো যে, বিদ্যাসাগর বলেননি হিন্দু দর্শন খারাপ ও পাশ্চাত্য দর্শন ভালো। তিনি শুধুমাত্র বাস্তব চিত্রটি তুলে ধরেছেন। আপাতদৃষ্টিতে অনেক সময় মনে হতে পারে বিদ্যাসাগর ভারতীয়ত্ববাদী ছিলেন না। কিন্তু তা সম্পূর্ণ ভুল। তাঁর জীবন ও কথায় ভারতীয় আদর্শই ধ্বনিত হয়েছে। বিদ্যাসাগর শিক্ষার্থীদের সুবিধার জন্য প্রচুর বই রচনা করেন। তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো— সংস্কৃত ব্যাকরণের উপক্রমণিকা, ব্যাকরণ কৌমুদী, বর্ণপরিচয়, কথামালা, নীতিবোধ, চরিতাবলী ও বোধোদয়। তিনি প্রথম গ্রন্থ রচনা করেন হিন্দি বেতাল পচ্চিসী অবলম্বনে রচিত বেতাল পঞ্চবিংশতি। এতে প্রথম যদি চিহ্নের সফল ব্যবহার করেন তিনি। মেকলে মিনিট এর কুপ্রভাবে দেশজ শিক্ষাব্যবস্থা ভেঙে পড়েছিল। এই বাস্তব চরিত্র তিনি উপলব্ধি করেছিলেন। এমনকী ১৮৫৪ সালে বাঙ্গলার লেফটেন্যান্ট গভর্নর এফ জে হ্যালিডে তাঁর প্রতেবেদনে বলেছিলেন, শিক্ষক ও পাঠ্যপুস্তকের অভাব দেশীয় ভাষা শিক্ষার যথেষ্ট অবনতি ঘটিয়েছে। সহকারি বিদ্যালয় পরিদর্শক হিসেবে বিদ্যাসাগর নদীয়া, বর্ধমান, হুগলি ও মেদিনীপুর জেলায় ৫টি মডেল স্কুল তৈরি করেন। ১৮৫৫ সালের জুলাই মাসে তিনি সংস্কৃত কলেজের প্রাঙ্গণে একটি 'নর্ম্যাল' স্কুল প্রতিষ্ঠা করেছিলেন, অক্ষয়কুমার দত্ত ও মধুসূদন বাচস্পতিকে এই স্কুলের শিক্ষকদের প্রশিক্ষণের দায়িত্ব দেন। বিদ্যাসাগর তৎকালীন সময় থেকে কতখানি এগিয়ে চিন্তাভাবনা করতেন তাঁর লেখা চিঠি দেখলে বোঝা যাবে। ১৮৫৯ সালের ২৯ সেপ্টেম্বর বাঙ্গলার লেফটেন্যান্ট গভর্নর জে পি গ্রান্টকে তিনি চিঠিতে লেখেন যে, এরকম একটি ধারণা এদেশে ও ইংল্যান্ডে গড়ে তোলা হয়েছে যে, সরকার উচ্চশ্রেণীর মানুষের মধ্যে শিক্ষা বিস্তারের জন্য অনেক কিছুই করেছে এবং এখন জনসাধারণের মধ্যে শিক্ষা বিস্তার করা দরকার। কিন্তু বাস্তব পরিস্থিতি তা নয়। উচ্চ শ্রেণীর মানুষকে শিক্ষিত করার জন্য সরকারের আগে একটি সুপরিকল্পিত কর্মসূচি নেওয়া উচিত। তিনি যথার্থই বলেছেন। কারণ, তৎকালীন সময়ে ইংরেজি শিক্ষা গ্রহণের ব্যয়ভার অত্যধিক হওয়ায় উচ্চশ্রেণীর মানুষেরা তা গ্রহণ করতে সক্ষম হলেও সমাজের সর্বস্তরের মানুষের পক্ষে তা সম্ভব ছিল না। তিনি চেয়েছিলেন উচ্চশ্রেণীর মানুষেরা সঠিকভাবে শিক্ষা গ্রহণ করে সর্বসাধারণের জন্য তারাই শিক্ষা বিস্তারে এগিয়ে আসুক। তখন ব্রিটিশ সরকার অপরিকল্পিতভাবে শিক্ষা বিস্তার করছিল। যার দরুন সমগ্র শিক্ষা ব্যবস্থা ভেঙে পড়ে। অশোক সেন তাঁর Vidyasagar and his illusive Milestones গ্রন্থে মন্তব্য করেন— বিদ্যাসাগরের শিক্ষা বিস্তারের প্রাথমিক উদ্দেশ্য ছিল পাশ্চাত্যের যুক্তিবাদী দৃষ্টিভঙ্গি শিক্ষার সর্বস্তরে ছড়িয়ে দেওয়া এবং বাঙ্গলার ছোটো শহর ও গ্রামগুলির নিম্নবিত্ত ভদ্রশ্রেণীর মধ্যে শিক্ষার প্রসার ঘটানো।

বিদ্যাসাগর নারীদের সর্বাঙ্গীণ বিকাশের জন্য বদ্ধপরিকর ছিলেন। তিনি বর্তমানকালের তথাকথিত নারীবাদীদের মতো মেকি নারী স্বাধীনতার কথা বলেননি। তিনি প্রকৃত নারী স্বাধীনতার জন্য কাজ করে গেছেন। নারী স্বাধীনতার প্রথম অঙ্গ হিসেবে বেছে নেন নারী শিক্ষার বিস্তারকে। ১৮৪৯ সালের ৭ মে শিক্ষা কাউন্সিলের তদানীন্তন সভাপতি জে ই ডি বেথুনের উদ্যোগে ২১ জন ছাত্রী নিয়ে হিন্দু নারী বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করেন। এই বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার পশ্চাতে বিদ্যাসাগর সর্বতোভাবে সাহায্য করেন। বিদ্যালয় পরিদর্শক থাকাকালীন বিদ্যাসাগর ১৮৫৭-১৮৫৮ খ্রিস্টাব্দ নাগাদ বর্ধমান, নদীয়া ও হুগলি জেলায় নিজের খরচে ৩৫টি মেয়েদের স্কুল তৈরি করেন। এই স্কুলগুলিতে ১৩০০০ ছাত্রী পড়াশোনা করত। তৎকালীন সময়ের পরিপ্রেক্ষিতে এই উদ্যোগ যথেষ্ট সাহসী ও প্রশংসাসূচক ছিল। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, বিস্তর লেখালেখির পর এই স্কুলগুলি খুলতে যে ব্যয় হয়েছিল সেই ভার বহন করতে সরকার স্বীকৃত হয়, কিন্তু একই সঙ্গে জানিয়ে দেয় যে এই

স্কুলগুলির জন্য কোনো নিয়মিত অনুদান সরকার পাঠাবে না। এরপর তিনি বীরসিংহ গ্রামে ১৮৯০ সালে ভগবতী বিদ্যালয় স্থাপন করেন। নারী শিক্ষার বিস্তারে তাঁর অবদানকে কখনোই অস্বীকার করা যায় না।

তৎকালীন সমাজ গোঁড়ামিতে নিমজ্জিত ছিল। ভারতীয় সমাজকে বিভিন্ন কুপ্রথা গ্রাস করেছিল। প্রাচীনকাল থেকে ভারতের নারী স্বাধীনতার যে উচ্চ ঐতিহ্য ছিল তা তৎকালীন সময়ে বিলোপ সাধন ঘটে। নারী স্বাধীনতার দ্বিতীয় অঙ্গ হিসেবে বেছে নেন বিধবা বিবাহ প্রচলন। এর জন্য ১৮৫৩ সালে বিধবা বিবাহের সমর্থনে প্রবন্ধ লেখেন এবং তিনি যুক্তি দিয়ে দেখান যে বিধবা বিবাহ হিন্দুশাস্ত্র সম্মত। এর জন্য তিনি পাশ্চাত্যের কোনো আইন বা গ্রন্থের অবলম্বন করেননি। তিনি ডুব দিলেন ভারতীয় ঐতিহ্য তথা হিন্দু ঐতিহ্যের সুমহান গ্রন্থের সমুদ্রে। 'পরাশর সংহিতা' থেকে উদ্ধৃতি দিয়ে দেখিয়ে দিলেন বিধবা বিবাহ হিন্দুশাস্ত্র সম্মত। উদ্ধৃতিটি হলো— 'নষ্টে মৃতে প্রব্রজিতে, ক্লীবে চ পতিতে পতৌ' অর্থাৎ স্বামী নিখোঁজ হলে বা তার মৃত্যু হলে, নপুংসক আর পতিত হলে তার স্ত্রী আবার বিয়ে করতে পারেন। এবার সমালোচকেরা প্রশ্ন করতে পারেন তিনি কেন ভারতীয় গ্রন্থ অবলম্বন করলেন? কেন তিনি পাশ্চাত্যমুখী হলেন না? কারণ তিনি জানতেন ভারতীয় শাস্ত্র ও ধর্মই হলো সবকিছু সমাধানের উৎস। ভারতবর্ষের প্রাচীনকালের নারী স্বাধীনতার ঐতিহ্যই তা প্রমাণ করে। তৎকালীন গোঁড়া সমাজ তাঁর এই পদক্ষেপে তীব্র প্রতিক্রিয়া জানায়। বহু গোঁড়া ব্রাহ্মণরা মানুষকে বিভ্রান্ত করার চেষ্টা করেন। বিদ্যাসাগর বুঝেছিলেন হিন্দুশাস্ত্র থেকে যুক্তি দিয়ে প্রমাণ করলে মানুষ তা দ্রুত গ্রহণ করবেন এবং বিভ্রান্তও হবেন না। ১৮৫৫ সালের ৪ অক্টোবর বিদ্যাসাগর বিধবা বিবাহের সমর্থনে এক হাজার সই সংগ্রহ করেন এবং সরকারের কাছে বিধবা বিবাহ আইন সম্মত করার দাবিতে একটি আবেদনপত্র পেশ করেন। ১৮৫৬ সালের ১৬ জুলাই কোম্পানির সরকার বিধবা বিবাহ সমর্থনে আইন পাশ করেন। ওই বছরের ৭ ডিসেম্বর কলকাতায় বিদ্যাসাগরের প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানে প্রথম বিধবা বিবাহ অনুষ্ঠিত হয়। এই বিবাহ যাতে সামাজিক ভাবে গ্রহণযোগ্য হয় তার জন্য তিনি প্রচুর কুলীন ব্রাহ্মণকে আমন্ত্রণ জানান। আর সফল করতে ১০ হাজার টাকা খরচ করেন। ১৮৫৬-১৮৬৭ সাল পর্যন্ত তিনি মোট ৬০টি বিধবা বিবাহের আয়োজন করেন এবং এই উপলক্ষে তিনি ৮২ হাজার টাকা খরচ করেন। তিনি বিধবা বিবাহের জন্য অকৃপণভাবে খরচ করতে থাকেন। এর ফলে তিনি ঋণগ্রস্তও হয়ে পড়েন। কিন্তু তিনি তাঁর লক্ষ্যে অবিচল থাকেন। সমালোচকরা আবারও বলতে পারেন যে, বিধবা বিবাহ কতটা সফল হয়েছিল? আদৌ সফল হয়েছিল? এর উত্তর অনুসন্ধানের জন্য আমাদেরকে তৎকালীন পরিস্থিতির পরিপ্রেক্ষিতে বিচার করতে হবে। তাহলে বোঝা যাবে তিনি তৎকালীন সমাজ ব্যবস্থার মধ্যে এক দীর্ঘস্থায়ী পরিবর্তন এনেছিলেন।

বিদ্যাসাগর এরপর বহু বিবাহ রোধ করার জন্য সোচ্চার হন। এই প্রথা সমাজে শক্তিস্বরূপা নারী জাতির কল্যাণের পরিপন্থী। তাই তিনি এর জন্য একটি সামাজিক আইন চেয়েছিলেন। তিনি 'বহু বিবাহ' নামে একটি ইস্তাহার প্রকাশ করেন এবং পরিসংখ্যান দিয়ে দেখান যে, ১৮৬৫-১৮৭১ সালের মধ্যে ১২০ জন কুলীন ব্রাহ্মণ বহুবিবাহে লিপ্ত হয়েছিলেন। তিনি প্রাচীন শাস্ত্র থেকে উদ্ধৃতি দিয়ে দেখালেন বহুবিবাহ শাস্ত্রসম্মত নয়। এরপর তিনি সমাজের আর একটি ব্যাধি বাল্যবিবাহ রোধ করতে অগ্রসর হন। তাঁর প্রয়াসে সরকার ১৮৬০ সালের একটি আইন প্রণয়ন করে মেয়েদের বিয়ের বয়স ১০ বছর ধার্য করে। এর জনেও বিদ্যাসাগরকে সমাজের বিভিন্ন মানুষের রোষের মুখে পড়তে হয়। কিন্তু তিনি তাতে এক বিন্দুও বিচলিত হননি। বিদ্যাসাগরের এই নারীকল্যাণ মানসিকতা তাঁকে ইতিহাস এক অনন্য স্থান দিয়েছে।

বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসেও তাঁর অবদান যথেষ্ট। বঙ্কিমচন্দ্র থেকে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর সকলেই বাংলা সাহিত্যে ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের অবদানকে স্বীকার করেছেন। প্রখ্যাত সাহিত্য সমালোচক সুশীলকুমার দে বিদ্যাসাগরকে বাংলা 'গদ্য-সাহিত্যের প্রকৃত স্রষ্টা' হিসেবে চিহ্নিত করেছেন। বিদ্যাসাগরের সুবিন্যস্ত রচনাশৈলী আমাদের মুগ্ধ করে। বিদ্যাসাগরের গদ্য সংস্কৃত নির্ভর সাধু ভাষা এবং বাংলা চলিত ভাষার অন্তর্বর্তী স্তরে বিচরণ করেছিল— এখানেই ছিল তাঁর কৃতিত্ব। তাঁর রচনাশৈলীর প্রধান বৈশিষ্ট্য ছিল— ভাব প্রকাশের জন্য উৎকৃষ্ট শব্দ ব্যবহারের মাধ্যমে সুললিত ছন্দের প্রয়োগ।

বিদ্যাসাগরকে বহু মানুষ 'দায়ার সাগর' নাম দেন। কারণ তাঁর কাছে যেই আসতেন তাকেই সাহায্য করতেন। তিনি এখনকার মতো মানুষকে ভিক্ষা দিতে চাইতেন না। মানুষকে প্রকৃত অর্থে স্বাবলম্বী হতে সাহায্য করতেন। একটা ঘটনার অবতারণা করা যেতে পারে। একদিন একটা ছোট্ট ছেলে এসে তাঁর কাছে এক আনা চাইল। তখন তিনি তাকে জিজ্ঞাসা করলেন তিনি যদি দু 'আনা দেন তাহলে ছেলেটি কী করবে? শুনে ছেলেটি বলল, এক আনা দিয়ে নিজে খাবার কিনবে ও এক আনা মাকে দেবে। এরপর বিদ্যাসাগর এক টাকা দিয়ে চলে গেলেন। এর ঠিক দু' বছর পর বিদ্যাসাগরের সঙ্গে ছেলেটির দেখা হতেই ছেলেটি তার দোকানে নিয়ে গেল। ছেলেটি ওই এক টাকা দিয়ে নিজের দোকান করে স্বাবলম্বী হয়ে উঠেছিল। এই ভাবে তাদের আর্থিক অনটন দূর করতে বিদ্যাসাগর বিশাল ভূমিকা পালন করেছিলেন। বঙ্গপ্রদেশে দুর্ভিক্ষের সময় বিদ্যাসাগর নিজের টাকা দিয়ে ত্রাণশিবির তৈরি করলেন। এইবাবে নিরন্ন মানুষের মুখে অন্ন তুলে দিলেন। জীবনের শেষের দিকে তিনি নিজের কর্মভূমি ছেড়ে সাঁওতাল পরগনার কার্মাটারে চলে গেলেন। কিন্তু সেখানেও তিনি চুপচাপ বসে থাকতে পারলেন না। ঝাঁপিয়ে পড়লেন গরিব সাঁওতালদের সাহায্য করার করার জন্য। তিনি দেখলেন সাঁওতালদের মধ্যে কেউ কেউ ভুট্টা উৎপাদন করেন আবার অনেকে সেটুকু করার সামর্থ্যও নেই। উপলব্ধি করলেন ওখানে ভুট্টা কেনার লোক নেই। তাই তিনি নিজের টাকা দিয়ে ভুট্টা কিনতেন আর যাদের ভুট্টা উৎপাদনের সামর্থ্য নেই সেইসব গরিব সাঁওতালদের মধ্যে সেই ভুট্টা বিলিয়ে দিতেন। এইভাবে প্রকৃত সর্বহারাদের সাহায্য করেছিলেন। তাঁর অকৃত্রিম সহযোগিতায় বহু মানুষের জীবন বেঁচে গিয়েছিল। বিদ্যাসাগরের আরেকটি সত্তা উল্লেখ না করলে চলে না। তা হলো তাঁর চিকিৎসক সত্তা। তিনি হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসা করতেন। এইভাবে বহু দরিদ্র মানুষের চিকিৎসা করে সুস্থ করে তুলতেন।

বিদ্যাসগরের জীবন ছিল এক সর্বত্যাগীর জীবন। সমগ্র জীবনই আমাদের সমাজ ও দেশের উন্নতির স্বার্থে নিয়োজিত করেন। তিনি স্বার্থশূন্য ভাবে মানুষের উন্নতির জন্য কাজ করে গেছেন। কিন্তু আমরা তাঁর প্রাপ্য সম্মানটুকু দিইনি। ■

পরম্পরা

আদিকবি বাল্মীকি

রাজদীপ মিশ্র

অনেক বছর আগে অনর্ত প্রদেশে (উত্তর সৌরাষ্ট্র বা উত্তর গুজরাট— বর্তমান নাম ভাটনগর) রত্নাকর নামে এক ব্যক্তি থাকতেন। বাবা-মায়ের প্রতি তাঁর খুব ভক্তি-শ্রদ্ধা ছিল। স্ত্রী-পুত্র নিয়ে সুখেই দিন কাটত। কিন্তু একটানা ১২ বছর অনাবৃষ্টির ফলে পরিবার প্রতিপালন দুঃসাধ্য হয়ে উঠেছিল। বাধ্য হয়েই দস্যুবৃত্তি শুরু করলেন রত্নাকর। একবার দেবর্ষি নারদের সঙ্গে দেখা হয়। তাঁর কথামতো রত্নাকর যখন বাড়ির সকলকে জিজ্ঞেস করলেন যে, তাঁরা তার এই পাপের ভাগীদার হবে কিনা। সকলেই নেতিবাচক উত্তর দেয়। এরপর প্রায়শ্চিত্ত স্বরূপ দেবর্ষি নারদ তাঁকে 'রাম' নাম জপ করে তপস্যা করতে বলেন। পাপী রত্নাকরের মুখে রামনাম উচ্চারণ হবে না জেনে নারদ তাঁকে 'মরা' শব্দ উচ্চারণ করতে বলেন। শুরু হলো রত্নাকরের কঠোর তপস্যা। 'মরা-মরা' বলতে বলতে 'রাম-রাম' উচ্চারিত হতে লাগল রত্নাকরের মুখ দিয়ে। এত কঠোর তপস্যা করলেন তিনি যে, তাঁর গোটা শরীরে উইপোকা মাটির ঢিবি বানিয়ে দিল। উইপোকার তৈরি মাটির ঢিবিকে বলে বল্মীক। ওই বল্মীক থেকে উঠে আসার জন্য তাঁর নাম হলো বাল্মীকি। রত্নাকরের দস্যুসত্তার মৃত্যু হলো।

আশ্বিন মাসের পূর্ণিমা তিথিতে (এই বছর ৩১ অক্টোবর) ত্রেতাযুগে বাল্মীকির জন্ম। তিনি ছিলেন ঋষি, মহর্ষি। আশ্রম তৈরি করে তিনি শিষ্যদের শিক্ষাদানে রত ছিলেন। প্রতিদিনের মতো সেদিনও তিনি স্নানের জন্য নদীতে যাচ্ছিলেন। পথে ছিল তমসা নদী,স যার জল পুণ্যবান মানুষের মনের মতো স্বচ্ছ। তাঁর সঙ্গে ছিলেন শিষ্য ভরদ্বাজ। তিনি লক্ষ্য করলেন এক পুরুষ ও এক স্ত্রী বক নিজেদের মধ্যে খেলায় মত্ত। বাল্মীকির চিত্ত প্রসন্ন হলো। কিন্তু হঠাৎ এক ব্যাধের তিরে পুরুষ বকটি মারা গেল এবং সেই দুঃখে স্ত্রী বকটিও প্রাণ ত্যাগ করল। এই করুণ দৃশ্য দেখে বাল্মীকির মন বিগলিত হলো। ব্যাধকে দেখে রেগে গিয়ে বাল্মীকি বলে উঠলেন—

"মা নিষাদ প্রতিষ্ঠা; ত্বমগমঃ শাশ্বতী সমাঃ।

যৎ ক্রৌঞ্চ মিথুনাদেকমবধি কামমোহিতম্।।

ভালোবাসায় লিপ্ত থাকা এক পাখিকে হঠাৎ বধ করার অপরাধে তুমি সারাজীবন কোনো শান্তি পাবে না। এটিই ছিল সংস্কৃত সাহিত্যের প্রথম শ্লোক।

দেবর্ষি নারদের কাছ থেকে বাল্মীকি একবার রামচন্দ্রের জীবন শ্রবণ করেছিলেন। একবার প্রজাপতি ব্রহ্মা বাল্মীকিকে রামচন্দ্রের জীবনী লিখতে নির্দেশ দেন। ব্রহ্মা তাঁকে ওই প্রথম শ্লোকটি যে ছন্দে লেখা সেই ছন্দেই রামায়ণ লিখতে বলেন। ব্রহ্মার বলে বাল্মীকি রামচন্দ্রের জীবনের সব ঘটনা প্রত্যক্ষ করতে পারলেন এবং ভবিষ্যতে কী ঘটবে সে সবও দেখার সৌভাগ্য অর্জন করলেন।

কবিতার আঙ্গিকে রচিত হলো 'রামায়ণ' মহাকাব্য। পৃথিবীর প্রথম কাব্য, তাই বাল্মীকিকে আদি কবিও বলা হয়। চব্বিশ হাজার শ্লোক ও সাতটি কাণ্ডে সম্পন্ন হয় রামায়ণ রচনা। রচনাকাল আনুমানিক খ্রিস্টপূর্বাব্দ পঞ্চম শতাব্দী।

মহর্ষি বাল্মীকি তাঁর রচিত 'রামায়ণ' মহাকাব্যের একজন চরিত্রও ছিলেন, যিনি সীতাদেবীকে তাঁর আশ্রমে আশ্রয় দিয়েছিলেন। সীতাদেবীর দুই পুত্র— লব ও কুশকে শাস্ত্র, শস্ত্র, সংগীত প্রভৃতি শিক্ষা দিয়ে প্রতিপালনও করেছিলেন।

রামায়ণ রচনা করে তিনি সম্পূর্ণ জগৎকে সৎপথে চলার রাস্তা দেখিয়েছিলেন। চেন্নাইয়ের থিরুবনমিয়ূরে বাল্মীকির মন্দির আছে, যা প্রায় ১৩০০ বছরের প্রাচীন। কথিত আছে রামায়ণ রচনার পর বাল্মীকি ওই স্থানেই থাকতেন। বাল্মীকি ভক্তরা বাল্মীকি জয়ন্তীর দিনে আধ্যাত্মিক গান, ভজন সহযোগে শোভাযাত্রা বের করে। এই উৎসব মূলত হিমালচল প্রদেশ, গুজরাট, পঞ্জাব, মধ্যপ্রদেশে বেশি পালিত হয়। ■

পরলোকে রামচন্দ্র সহস্রভোজনী

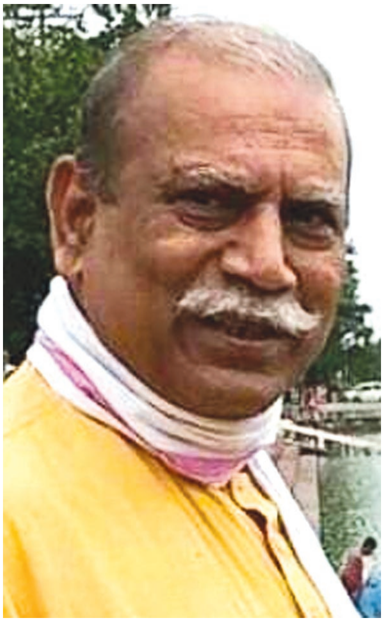

রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের প্রবীণ প্রচারক রামচন্দ্র নরহরি সহস্রভোজনী গত ৩০ সেপ্টেম্বর করোনা আক্রান্ত হয়ে নাগপুরে একটি হাসপাতালে পরলোকগমন করেন। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৭৮ বছর। বঙ্গপ্রদেশের স্বয়ংসেবকদের কাছে তিনি 'রাম-দা' নামে পরিচিত ছিলেন। ছোটোবেলায় তিনি বাবা-মাকে হারান। মধ্যপ্রদেশে মামার কাছে মানুষ হন। উচ্চশিক্ষা শেষ করে ভারতীয় রিজার্ভ ব্যাঙ্কের চাকরিতে যোগ দেন। ১৯৭০ সালে সঙ্ঘকাজের প্রয়োজনে চাকরি থেকে অব্যাহতি নিয়ে সঙ্ঘের প্রচারক জীবনের ব্রত গ্রহণ করে নাগপুর থেকে বঙ্গপ্রদেশের মুর্শিদাবাদ জেলা প্রচারক, ১৯৭৪-এ কলকাতায় প্রচারক, ১৯৭৫-এ জরুরি অবস্থার সময় কলকাতা শহরে সম্পর্কের কাজ, ১৯৭৭ থেকে '৭৯ কলকাতা সহ মহানগর প্রচারকের দায়িত্ব পালন করেন। ১৯৮০ সালে বাড়ি ফিরে যান। এসময় একটি দৈনিক পত্রিকার সম্পাদকের দায়িত্ব গ্রহণ করেন এবং সঙ্গে সঙ্গে ইতিহাসে এমএ করেন। ১৯৮২ সালে আবার প্রচারক হিসেবে বের হয়ে ১৯৯২ পর্যন্ত ত্রিপুরায় বিভাগ প্রচারকের দায়িত্ব পালন করেন। ১৯৯২ থেকে '৯৪ বিশ্ব হিন্দু পরিষদের পূর্বোত্তর ক্ষেত্রের ক্ষেত্রীয় সহ সংগঠন সম্পাদকের দায়িত্ব পালন করেন।

১৯৯৫ সালে দক্ষিণ বিহারের সহ প্রান্ত প্রচারক, ১৯৯৭ থেকে '৯৯ অখিল ভারতীয় সহ শারীরিক শিক্ষণ প্রমুখের দায়িত্ব পালন করেন। '৯৯ সালে ত্রিপুরায় ১ জন কার্যকর্তা ও ৩ জন প্রচারক এনএলএফটিটি জঙ্গি দ্বারা অপহৃত হলে রামদা তাঁদের মুক্তির অক্লান্ত প্রয়াস করেন। ২০০১ সালে বিদর্ভ প্রান্ত প্রচারক, ২০০৩ থেকে ২০০৯ পশ্চিম ক্ষেত্রের শারীরিক শিক্ষণ প্রমুখ এবং ২০০৯ থেকে '১২ পশ্চিম ক্ষেত্রের প্রচারক প্রমুখের দায়িত্ব পালন করেন। ২০১২-র নভেম্বর থেকে দায়িত্বমুক্ত হয়ে জ্যেষ্ঠ প্রচারক হিসেবে নাগপুর কেন্দ্রীয় কার্যালয়ে থাকতেন।

দরিদ্র মানুষের প্রতি রাজ্য সরকারের বঞ্চনার প্রতিবাদে রাজ্যপালের নিকট স্মারকলিপি

নিজস্ব প্রতিনিধি ।। দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলায় আমফান ঝড়ে ক্ষতিগ্রস্ত তপশিলি শ্রেণীভুক্ত হতদরিদ্র মানুষদের প্রতি রাজ্য সরকারের বঞ্চনার প্রতিবাদে এবং সামাজিক ন্যায় ও সুরক্ষার দাবিতে গত ২৫ সেপ্টেম্বর অধ্যাপক পার্থ বিশ্বাসের নেতৃত্বে তপশিলি সমাজ অধিকার রক্ষা মঞ্চের পক্ষ থেকে মহামহিম রাজ্যপালের নিকট স্মারকলিপি দেওয়া হয়। প্রতিনিধি দলে ছিলেন দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলা প্রমুখ শ্রীকুমার চন্দ্র পর্বত, শিক্ষক সৈকত মণ্ডল, শিক্ষক অভিজিত সরদার, সমাজসেবী উৎপল নস্কর প্রমুখ। ক্ষতিগ্রস্ত দুঃস্থ প্রতিনিধি হিসেবে ছিলেন গোসাবা ব্লকের জগন্নাথ মণ্ডল, জয়নগর ব্লকের তপন নস্কর ও কুলতলী ব্লকের বাবুরাম মণি।

বেঙ্গল সামুই ফ্যাক্টরী

নিউ কমল ব্রাণ্ডের ভাজা সামুই ব্যবহার করুন।
মাত্র দুই মিনিটে ক্ষীর তৈরী হয়।

শান্তিনিকেতন, বোলপুর,
মোবাইল - ৯২৩২৪০৯০৮৫

যোগ চিকিৎসা

যে কোনো শারীরিক-মানসিক রোগ, মেধা স্মৃতি-বুদ্ধি বৃদ্ধি, পড়াশুনায় উন্নতি— বিশিষ্ট যোগ চিকিৎসক-গবেষক অধ্যাপক দীপেন সেনগুপ্তের তত্ত্বাবধানে সম্পূর্ণ ভারতীয় পদ্ধতিতে মাত্র ৪০০০ টাকায় ভর্তির দিন থেকে ১ বৎসর যোগ চিকিৎসার ব্যবস্থা করা হয়েছে। চার বৎসর বয়স থেকে সদস্য/সদস্যা নেওয়া হচ্ছে।

স্বামী সন্তদাস ইনষ্টিটিউট অব কালচার
যৌগিক কলেজ

১০১, সাদার্ন অ্যাভিনিউ, কলকাতা-২৯
ফোন : ২৪৬৪-৬৪৬৪, ২৪৬৩-৭২১৩

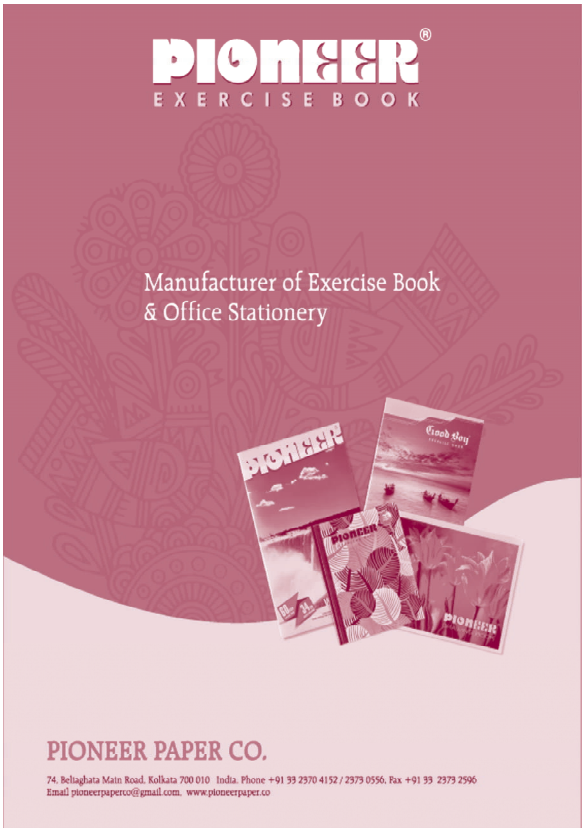

SURYA
Energising Lifestyles
Innovative
DESIGN
World-Class Quality
PRODUCTS
Just One Name
SURYA
lighting
fans
appliances
pipes
SURYA ROSHNI LIMITED
E-mail: consumercare@sroshni.com | www.surya.co.in
Tel.: +91-11-47108000, 25810093-96
Toll Free No.: 1800 102 5657
/suryalighting | /surya_roshni